৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

মাঘ, ১ ৩০।

সম্পাদক—

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি, এ।

প্রতি সংখ্যা

।০ আনা।

আমার দেশ

মাঘ মাসের সূচীপত্র

চিত্র পরিচয়——বুদ্ধের জন্ম। প্রথমেই যে বহুবর্ণ চিত্রখানি মুদ্রিত হইয়াছে, সেখানি বুদ্ধদেবের জন্ম সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে, তাহাই অবলম্বনে অঙ্কিত হইয়াছে। গল্পটী এই,——বুদ্ধদেব তুষিত স্বর্গে অবস্থান করিতে করিতে যখন তাঁহার নরদেহ ধারণের সময় আগত বুঝিলেন, তখন তিনি কোন্ বংশে, কোন্ দেশে, কোন সময়ে ও কোন্ মাতার গর্ভে জন্ম লইবেন চিন্তা করিয়া কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পত্নী মহামায়াকেই মাতৃত্বে বরণ করিলেন। এবং নিশীথ-রাত্রে একটী শ্বেত হস্তীর রূপ ধরিয়া সুপ্তিমগ্না মহামায়ার গর্ভে প্রবেশ করিলেন। মহামায়া স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার গর্ভে শ্বেত হস্তী প্রবেশ করিল। রাণীর স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া পরদিন জ্যোতির্ব্বিদগণ ঘোষণা করিলেন, মহামায়া এক বিশ্ববরেণ্য সন্তান প্রসব করিবেন।

মহামায়ার স্বপ্ন দর্শন।

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ।

আমার দেশ

৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

মাঘ, ১৩৩০।

শিশুদের জন্য

প্রভাত

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল,
কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল।
রাখাল গরুর পাল ল'য়ে যায় মাঠে,
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।
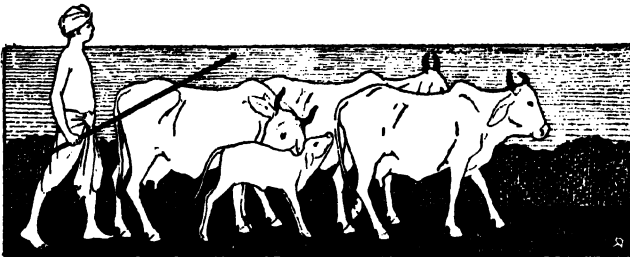
ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল,
পরিমল-লোভে অলি আসিয়া জুটিল,
গগনে উঠিল রবি লোহিত বরণ,
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন।
শীতল বাতাস বয়, জুড়ায় শরীর,
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।
উঠ শিশু, মুখ ধোও, পড় নিজ বেশ
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।
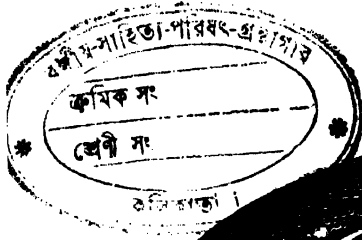
বিজ্ঞানের চুট্‌কী।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম ?

[শ্রীকালিপ্রসাদ ঘোষ, বি, এস্, সি]

আমরা সর্ব্বত্রই শুন্‌তে পাই যে অহিংসাই হচ্ছে পরম ধর্ম্ম। শুধু যে বুদ্ধদেবের মুখ থেকেই কথাটা বেরিয়েছে, আর শুধু যে তাঁরই শিষ্যরা আজও পর্য্যন্ত সেই বাণী জগতের লোককে শুনিয়ে আস্‌ছেন তা নয়। প্রত্যেক যুগেই, প্রত্যেক কালেই পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে অনেক জ্ঞানী অনেক মহাত্মা পৃথিবীর লোককে একথাটা বেশ জোর দিয়েই শুনিয়ে গেছেন;—সেই যীশু খৃষ্ট থেকে আমাদের এখনকার মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত অনেকেই। এই সব জ্ঞানী লোকেরা কোনও স্বার্থের প্রলোভনে এসব কথা বলেন নি;—বেশ ভেবে চিন্তেই জগতের মঙ্গলের জন্যই তাঁরা যুগে যুগে এ বাণী প্রচার করে গেছেন। জগতের লোকেরাও বেশ শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের কথা মেনে নিয়েছে। অবশ্য হিংসাটা তারা কোনও কালেই একেবারে ছাড়তে পারে নি;—অথবা যদিও ছেড়ে থাকে তো সেটা নিতান্তই সাময়িকভাবে। এতদিনকার ইতিহাসে তাদের এই ভাবটাই প্রকাশ পেয়েছে যে, "ওগো, বুঝি আমরা যে হিংসাটা পাপ; কিন্তু কেমন আমাদের দুর্ব্বলতা যে কিছুতেই হিংসা না করেও থাক্‌তে পারি না।" এই ভাবেই তো পৃথিবীটা চলে আস্‌ছে দেখ্‌ছি।

এদিকে আবার **জীববিজ্ঞান** নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান, তাঁরা কিন্তু ঠিক এর উল্‌টো কথাটাই বরাবর মানুষকে শুনিয়ে আস্‌ছেন। ডারউইন্ সাহেব থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় সবাই ব'লে বেড়াচ্ছেন যে, তাঁরা পৃথিবীর নানা রকম বেরকমের প্রাণীর স্বভাব বংশ-বৃদ্ধি ও পরিণাম সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান ক'রে এই সিদ্ধান্তেই এসে উপস্থিত হয়েছেন যে পৃথিবীতে অযোগ্যের স্থান নেই। অর্থাৎ অযোগ্যকে প্রাণটী
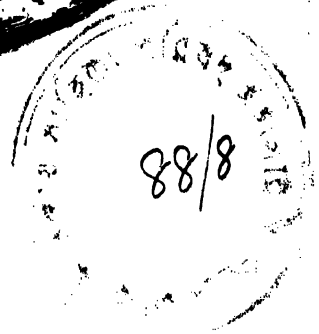
ত্যাগ করে' যোগ্যের থাক্‌বার জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হয়, এই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। কথাটা আর একটু স্পষ্ট করেই বলি। এই পৃথিবীতে রোজ রোজ রকম বেরকমের জীব নাকি এত অসংখ্য জন্মাচ্ছে যে তাদের সকলকে যদি সুস্থচিত্তে বেঁচে বর্ত্তে থেকে নির্ঝঞ্ঝাটে বংশবৃদ্ধি কর্ত্তে দিতে হয়, তাহলে এ পৃথিবী তো তুচ্ছ, এর মত একলক্ষ পৃথিবীতেও জায়গা কুলোবে না। কথাটা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না, না? বিশ্বাস না হবারই কথা বটে। কিন্তু একটু খানি ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে কথাটায় মিথ্যার এতটুকু গন্ধও নেই। এই ধরুন না, আমাদের ব্যাঙ মশাইকে। একটী ব্যাঙ এক একবারে অন্ততঃ দু'হাজারটী ডিম ছাড়েন। মা ষষ্ঠীর কল্যাণে যদি সব ক'টী বাচ্ছা বেঁচে বর্ত্তে থাকে, তাহলে (ফি বছর একটী করে প্রসব ধরে নিলে,) একটী ব্যাঙ থেকে এক বছরে দু'হাজার ব্যাঙ পাওয়া গেল। দ্বিতীয় বছরে এই দুহাজার ব্যাঙের প্রত্যেকটী আবার যদি দুহাজার করে ডিম ছেড়ে সব বাচ্ছাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, তবে দুবছরের মধ্যেই একটা ব্যাঙের বংশেই ২০০০ × ২০০০ বা ৪০ লক্ষ ব্যাঙের আবির্ভাব। তিন বছরে এর সংখ্যা হবে ২০০০ × ৪০ লক্ষ বা ৮০০ কোটী; চার বছরে হবে ২০০০ × ৮০০ কোটী বা ১৬,০০,০০০ কোটী;—ব্যাস্, আর হিসেব আমার ছোট্ট মাথায় ঢুক্‌ছে না।—এমনি করে' পাঁচ বছর, ছবছর, দশ বছর, পঞ্চাশ বছর, একশ বছর, যদি চলে, তা'হলে মশাইগো, কটা পৃথিবী আপনার ইজারা মহল আছে যে এদের সবাইকার থাকবার জায়গা ক'রে দিতে পারেন? তারপর ধরুন বটগাছ। একটী বটগাছ তো প্রায় একটী বিঘে জমি দখল ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন (বোটানিকেল গার্ডেনের বটগাছ, বা মধুপুরের বটগাছ তো আরও বেশী জায়গা দখল করে আছেন)। একটী বটগাছে ফিবছরে কত ফল হয় মনে করেন? ছোট ছোট লাল মার্বেলের মত বটের ফল মনে আছে বোধ হয়? এক একটী ফলের মধ্যে আবার অনেকগুলি ক'রে বীচি। প্রত্যেকটী বীজ থেকে যদি একটী করে চারাগাছ জন্মাত, তাহলে ফিবছরেই একটা বটগাছ থেকে (খুব কম করে ধরেও) ১০ লক্ষ বটের চারার সৃষ্টি হত। যদি ধরা যায় একটা বট গাছ বড় হয়ে ফল দিতে পঁচিশ বৎসর সময় লাগে, তাহলে পঁচিশ বৎসর বাদে শুধু প্রথম বছরের চারাগাছ গুলোর বংশেই ১০ লক্ষ × ১০ লক্ষ বা ১০০০০০ কোটী চারা গাছ জন্মাবে। এ অনুপাতে তো প্রতি বছরই চল্‌বে। একশ বছর বাদে, হাজার বছর বাদে অবস্থাটা তাহলে কি রকম হয় তা কি ঠাওর কর্ত্তে পারেন? বলুন দেখি সে হিসেবে পৃথিবীর জায়গা কতটুকু! আর সত্যই যদি পৃথিবীর অবস্থাটা এই রকমই হোত, তবে ভাবুন দেখি একটুখানি থাকবার জায়গা আমিই বা কোথায় পেতুম আর আপনিই বা কোথায় পেতেন;—তা সে আপনি শ্রীযুত বিষ্ণুপদ মুখুয্যেই হোন্, বা মুন্না ডোমই হোন্। ঘোড়দৌড়ের জন্য অতখানি খোলা মাঠ কি তাহলে আর বাছাধনদের ব্যারাক্‌পুরে জুট্‌ত, না, মাণিক শীলেরা কল্‌কাতা সহরের বুকের উপর দুবিঘে জমি শুধু বাগান করে ফেলে রেখে দিতে পার্ত্তেন?

আপনারা বাইবেল পড়েছেন? মনে আছে সেই জলপ্লাবনের গল্প? একবার যখন পৃথিবীর লোকেরা সব বেজায় বদমাস্ হয়ে উঠ্‌ল, তখন ঈশ্বর মহা রেগে, ক্রমাগত চল্লিশ দিন ধরে বৃষ্টি

করে পৃথিবীর সব প্রাণীকে মেরে ফেল্‌লেন। কিন্তু পাছে তাঁর এত সাধের সৃষ্টি সব একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়, এই জন্য তাঁর পরম ভক্ত "নোয়া"কে সপরিবারে একটা জাহাজে চড়িয়ে বাঁচিয়ে রাখলেন। আর সেই সঙ্গে পৃথিবীর প্রত্যেক রকমের একজোড়া করে প্রাণীকেও বাঁচিয়ে রাখলেন। তাই গরু, ঘোড়া, মোষ, গাধা, উট, হাতি, বাঘ, সাপ, ব্যাঙ, বিছা থেকে আরম্ভ করে গিরগিটী, টিকটিকী, ঝিঙ্গে পটল, উচ্ছে, কাঁচকলা পর্য্যন্ত সবই এ যুগে এখনও দেখ্‌তে পাচ্ছেন। এই উপাখ্যান থেকে আর কিছু না হ'ক অন্ততঃ এ টুকু বেশ বোঝা যাচ্ছে যে জগদীশ্বরের আন্তরিক ইচ্ছা সৃষ্টি বৈচিত্রটা পুরামাত্রায় বজায় রাখা। বেশ ইচ্ছা, সাধু ইচ্ছা। কিন্তু শুধু ইচ্ছা থাকিলেই হয় না; ইচ্ছার অনুযায়ী কাঠখড়ও পোড়ান দরকার। আমাদের শ্রীমান 'বু'র ইচ্ছা, কলিকাতা সহরের এগার হাজার প্রাইভেট মোটর গাড়ীর সবকটীকেই তিনি দখল করে বসে থাকেন; কিন্তু যেহেতু শ্রীমান্ 'বু'র বাবা ত্রিশ-টাকার বেশী খরচ কর্ব্বেন না, সেই হেতু শ্রীমান 'বু'কে একটা ট্রাইসাইকেল দখল করেই শান্ত থাক্‌তে হয়েছে। সৃষ্টিকর্ত্তার শুভ ইচ্ছা অনুসারে এই জগতের বিরাট সৃষ্টিবৈচিত্রও যদি পুরামাত্রায় বজায় রাখ্‌তে হয়, তা হলে তো এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে কুলায় না। কিন্তু অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও অনন্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও যখন মঙ্গলময় জগদীশ্বর এই ছোট পৃথিবীটুকু দিয়েই কাজ সারবেন, তখন অগত্যা তাঁর বিরাট সৃষ্টিবৈচিত্রের বিপুল কল্পনার আদর্শটারও কিছু রকমফের কর্ত্তে হল। আপনার এবং আমার মাথার চেয়ে যেহেতু সৃষ্টিকর্ত্তার মাথাটা অনেক বেশী সাফ (যদি অবশ্য মাথা তাঁর সত্যিই একটা থাকে,) তাই উপায় ভেবে বের কর্ত্তেও তাঁর বিশেষ দেরী হল না। মঙ্গলময় জগদীশ্বর ভেবে দেখলেন যে, যদিও প্রত্যেক রকমের প্রাণী অসংখ্য করে জন্মাবে, কিন্তু তাদের সবাইকার বেঁচে থাকবার দরকার নেই; বরং সবাইকার না বাঁচাই মঙ্গল; প্রত্যেক রকমের জীব কিছু কিছু বাঁচলেই হল;—কারণ সেই উপায়েই সৃষ্টি বৈচিত্র রক্ষা পাবে। অমনি করুণাময় জগদীশ্বর তাঁর অশেষ করুণায় জীব সকলের মধ্যে জীবন সংগ্রামের সৃষ্টি করলেন;—এক জীবকে অপর এক জীবের খাদ্য করে দিলেন; জীবের মনটীর মধ্যে হিংসা পুরে দিলেন। সেই থেকেই ঘোড়া ঘাস খেতে ছুট্‌ল, সাপ ব্যাঙ খেতে ছুট্‌ল, ব্যাঙ পোকা খেতে ছুট্‌ল, বাঘ হরিণ খেতে ছুট্‌ল, বেরাল ইন্দুর খেতে ছুট্‌ল, গরীবলোকে শুধু হাওয়া খেতে ছুট্‌ল, আর আমার মত লোকে খাবি খেতে ছুট্‌ল। সেই থেকেই হিন্দু পাঁঠা-খোর, মুসলমান গরু-খোর, সাহেবরা শূয়ার-খোর, আর ছারপোকারা মানুষের রক্ত খোর। তাই ইংরাজরা জার্ম্মাণ মারে, জার্ম্মাণেরা ফরাসী মারে, আমেরিকানরা নিগ্রো মারে, সাহেবেরা কাফ্রি মারে, সাদারা কালা মারে, আর গুণ্ডারা নির্ভয়ে নিরীহ পথিক মারে। তাই রাম শ্যামের হিংসা করে। বিষ্ণু মুখুয্যে সন্তোষ চাটুয্যের হিংসে করে;—আর সতীশ বাবু জ্যোতিষবাবুর হিংসে করে, এ সবই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম—মঙ্গলময় জগদীশ্বরের মঙ্গলময় বিধান। এমনি করেই তাঁর অতি প্রয়োজনীয় ধ্বংশ কার্য্য সাধিত হচ্ছে। এতে তোমার আমারও যেমন কোনও হাত নেই, বুদ্ধদেব বা যীশু-খৃষ্টেরও তেমনি বোধ করি কোনও হাতই নেই। এই মঙ্গলময় বিধানের অবশ্যম্ভাবী ফল

যা, তাও ফলাতে কিছু কসুর হয় নি। তাই বটগাছ জন্মাবার জন্যে জায়গা ছেড়ে না দিয়ে, মানুষ সেগুলোকে এমন নির্ম্মমভাবে কেটে সাফ করে নিজেদের থাক্‌বার জায়গা করে নিয়েছে যে এখন বটগাছ দেখবার জন্য কল্‌কাতার ছেলেমেয়েদের বোটানিকেল গার্ডেনে যেতে হচ্ছে; একটা সিংহ দেখবার জন্যে আলিপুরের বাগানে যেতে হচ্ছে। তাই বিষ্ণু মুখুয্যে আর মুন্না ডোমের পাশে আমিও এক হাত জায়গা নিয়ে পড়ে থাক্‌তে পেয়েছি। এই সব দেখে শুনে, জিজ্ঞাসা কর্ত্তে ইচ্ছা হয় না কি যে, অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, না, হিংসাটাই পরম ধর্ম্ম?

ওস্তাদ নরেন্

রোজ সকালে নরেন বাবু
গড়ের মাঠে যান,
বাইসিক্‌লে চড়ে বাবু
গড়ের হাওয়া খান।
সকাল সকাল চা পান করে
বাহির হওয়া চাই,
বাইক্ চালানো ছাড়া তাঁহার
আর কোনো কাজ নাই।
চালিয়ে গাড়ী দেমাক ভারি
নরেন বাবুর মনে,
ওস্তাদীতে পার্‌বে না কেউ
ভাবেন তাঁহার সনে।

একদিন হায় ওস্তাদী তাঁর
কোথায় গেল ছুটে,
পড়্‌ল চাপা কুকুর ছানা—
নরেন ধুলায় লুটে !
আরেক দিন এক কাণ্ড হ'ল
বল্‌ব তাহা কি—
ছুটে গেল নরেন বাবুর
সকল চালাকী
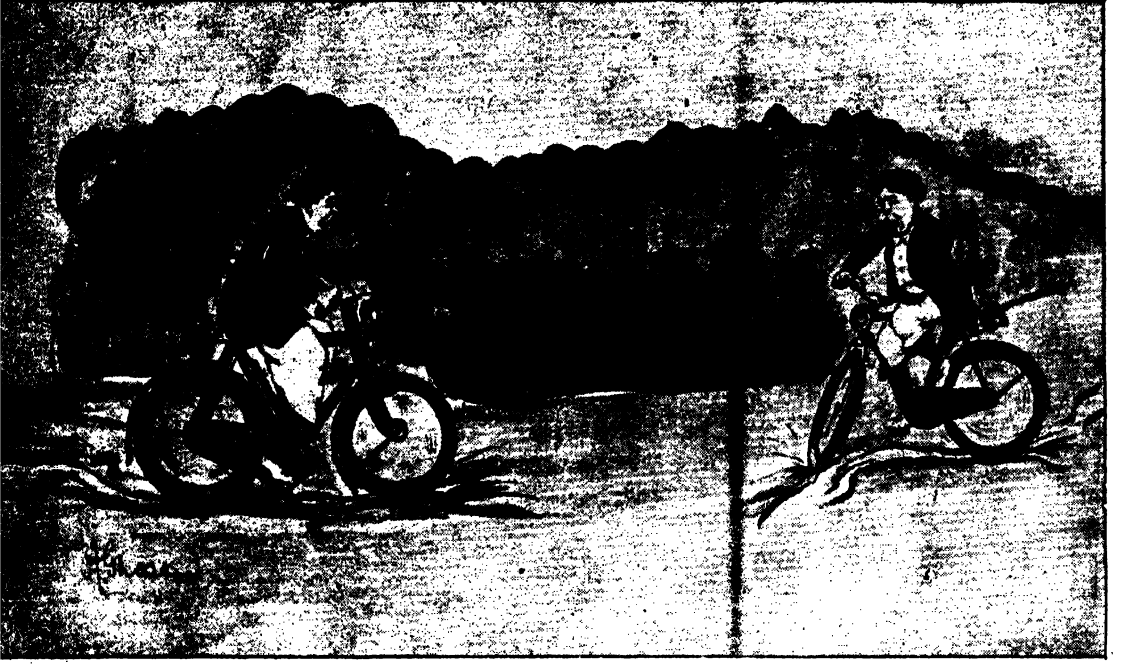
মনের সুখে যেতেছিলেন
শিস্ দিয়ে, গান গেয়ে,
সমুখ থেকে আরেকটা লোক
হঠাৎ এল ধেয়ে ;
এমন জোরে ছুটছে গাড়ী
ফিরিয়ে নেওয়া দায়,
ধাক্কা লেগে আজকে বুঝি
দুজন মারা যায় !

মুখখানা তার কাঁচুমাচু—
হাত দুখানি কাঁপে,
নরেন ভাবে—আজ বুঝি হায়
ধরল মহাপাপে ।
ভাব্‌বার হায় নাইকো সময়,
হঠাৎ হোল কি ?—
উঠ্‌ল ফুটে নরুর চোখে
হাজার জোনাকী !

চেয়ে দেখে নরেন সে ত
 আর এ রাজ্যে নয়,
গাছপালা সব ডিঙিয়ে সে যে
 বেড়ায় আকাশ ময় !
খানিক পরে পড়ল নরেন
 নীচে— ধরার তলে,
কাপড় জামা সব ছিঁড়েছে—
 চোখ ভেসে যায় জলে !

বাইসিক্লের দফা রফা—
 কাপড় জামা সারা,
ভাগ্যি নেহাৎ ভালো, তাইতে
 যায়নি প্রাণে মারা।
ধীরে ধীরে উঠে দুজন
 যে যা'র বাড়ী যায়,
দুঃখে লাজে মলিন মুখে
 এ ওর পানে চায়।

নরেন বাবুর ওস্তাদীতে
ভরা আছে পেট,
কিন্তু এখন বল্লে পরেই
মাথা করেন হেঁট।
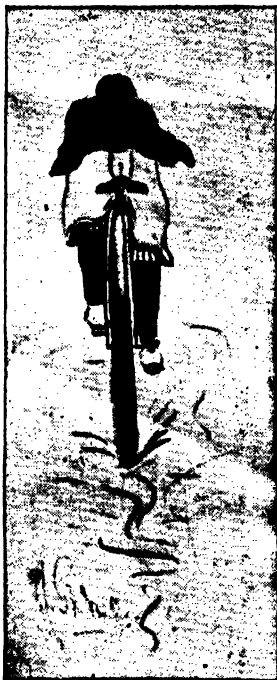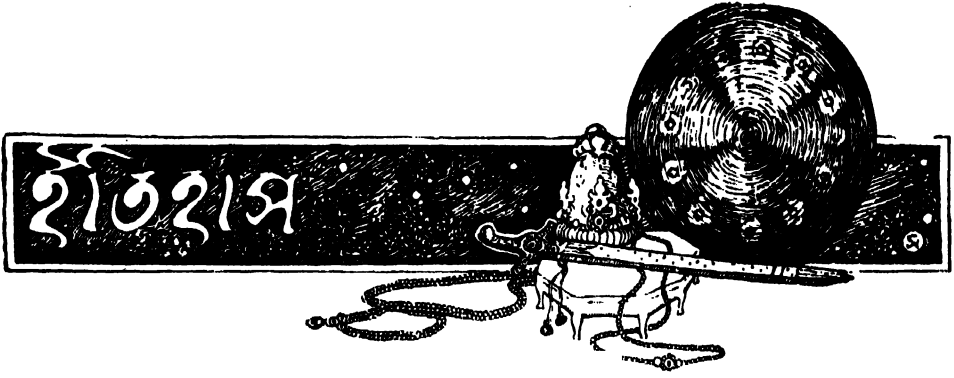
বালক সম্রাট

একটি চৌদ্দ বৎসরের বালকের মাথায় যখন মুকুট পরাইয়া তাহাকে বিশাল একটি সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার পরোয়ানা দিয়া পাঠান হয়, তখন তাহা তাহার পক্ষে সৌভাগ্যের কি দুর্ভাগ্যের ব্যাপার তাহা কি তোমরা বলিতে পার ? ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভগবান একটি বালকের উপর একবার এইরূপ দায়ীত্বের বোঝা চাপাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা যুদ্ধে প্রতিপক্ষের নিকট পরাজিত হইয়া কয়েকটি মাত্র অনুচর লইয়া মরুভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, সেখানে তাঁহারই একটি অনুচরের চৌদ্দ বৎসরের মেয়ের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন, মেয়েটি প্রথমে বলিল "আমি রাজ-রাজরার সহিত বিবাহ করিতে চাহি না" কিন্তু সিংহাসনচ্যুত সম্রাটের সহিত সাধারণ লোকের বিশেষ তফাৎ নাই ভাবিয়া মেয়েটি তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। এই বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে আমাদের এই গল্পের নায়কের জন্ম হয়। পিতা এত গরীব যে এই আনন্দকর ঘটনাতে তিনি কেবল একখণ্ড মৃগনাভি লইয়া তাহা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া বন্ধু বান্ধবের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া বলিলেন "এই ক্ষুদ্র জিনিষ ছাড়া আমার কাছে এমন কিছু নাই যাহা আমি আপনাদিগকে দিতে পারি। কিন্তু আমি আশা করি যেমন ইহার সুগন্ধ ঘরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে তেমনি যেন আমার এই পুত্রের সুনাম পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।" এক বৎসর বয়সে এই শিশুটি পিতামাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহার খুড়ার নিকট মানুষ হইতে থাকেন। তাঁহার খুড়া ছিলেন তাঁহার পিতার শত্রু, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি এই শিশুটিকে অনাদর কিম্বা অযত্ন করেন নাই।

তাহার কিছুকাল পরে তাঁহার পিতা মাতা ফিরিয়া আসিয়া কাবুল রাজ্য অধিকার করেন, এবং তাঁহার শিশুকে ফিরিয়া পাইলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার শিশুর জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন, কিন্তু বালকের মন পড়া শুনায় ছিল না, তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে যে এই বালকটি যিনি একদা সমগ্র ভারতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়াছিলেন, বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে তাঁহার ভাষার ক, খ, শেখাইতে পারা

যায় নাই। খেলাধুলা এবং শীকারে তাঁহার মাথা খুব ছিল, এ হেন বালককে তোমাদের পিতামাতা ডানপিটে বলিবেন, কিন্তু তখনকার দিনে লড়াই ছিল সব চেয়ে বড় ব্যবসা, রাজার ছেলে যদি লেখা পড়া না শিখিত তাহা হইলে তখনকার দিনে বিশেষ কোন ক্ষতি হইত না। আমাদের এই বালকটি অসম সাহসী ছিলেন এবং কোন বিপদেও পিছপাও হইতেন না। লেখা পড়া না শিখিলেও তাঁহার আশ্চর্য্য স্মৃতিশক্তি ছিল। এক বৎসর বয়সের সময়ে যে সব ঘটনা ঘটিয়াছিল বৃদ্ধ বয়সেও সেগুলি তিনি ভোলেন নাই। তাঁহার শিক্ষকগণ তাঁহার নিকটে যে সব কবিতা এবং ভাল ভাল বই পড়িয়া শোনাইতেন, সেগুলি তাঁহার মনে গাঁথা হইয়া থাকিত।

প্রতিপক্ষের বংশধরকে হারাইয়া দিয়া তাঁহার পিতা অবশেষে দিল্লীর সিংহাসন ফিরিয়া পাইলেন। কিন্তু সম্মুখে তাঁহার বিপদের সমুদ্র ছিল। সমস্ত দেশময় বিদ্রোহ এবং বিশৃঙ্খলতা। যে টুকু যায়গায় তিনি তাঁহার প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা ভারত সম্রাজ্যের তুলনায় অত্যন্ত সামান্য। তাঁহার কর্ম্মচারিগণও যে খুব বিশ্বাসী ছিলেন তাহাও নহে। বৃদ্ধ পিতা কেবল মাত্র একটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কালের শমন তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়াছিল, তিনি তাঁহার পুস্তকাগার হইতে নামিতে গিয়া পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলেন, এবং তাহাতে তাহার গুরুতর আঘাত লাগে, কয়েক দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

এই সময়ে তাঁহার পুত্রের বয়স মাত্র চোদ্দ বৎসর। এই বয়সেই কর্ম্মচারিগণ তাঁহার মাথায় মুকুট পরাইয়া দিয়া হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কেহ কেহ পরামর্শ দিয়াছিল, “কাজ কি হিন্দুস্থান লইয়া লড়াই করিয়া, কাবুলে ফিরিয়া যাওয়া যাক্।” কিন্তু এই বালকটি এবং তাঁহার অভিভাবক ঠিক করিলেন যে বিপদ দেখিয়া পিছাইয়া যাওয়া ভীরুর কাজ, বিপদকে বরণ করাই ত বীরত্ব। সেইজন্য তাঁহারা সমস্ত ঝঞ্ঝা ঝড় মাথায় করিয়া লইয়া ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যের জন্য প্রাণপণে লড়াই করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে বালক সম্রাট তাঁহার অভিভাবকটিকে বিদায় দিলেন এবং ষোলো বৎসর বয়সে নিজের হাতে সিংহাসনের সমস্ত দায়ীত্ব ভার গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা তাঁহার অধীনে কাজ করিতেন তাঁহারা খুঁজিতেন কি করিয়া তাঁহারা বড় হইবেন, সেইজন্য এই বালকটি ঠিক করিলেন যে তিনি রাজকার্য্যে কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিবেন না। নিজের বুদ্ধির দ্বারাই তিনি তাঁহার সাম্রাজ্য শাসন করিবেন।

তখন হিন্দুস্থানে এখনকার মতই দুইটি বড় সম্প্রদায় ছিল, হিন্দু ও মুসলমান। হিন্দু ছিল প্রজা, মুসলমান ছিল রাজার জাতি। দুই জাতিতে যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল তাহা নহে। মুসলমান বাদসারা মুসলমানদের জন্যই রাজত্ব করিতেন। হিন্দু ছিল গোলামের জাত। কিন্তু এখনকার মতন তখনও হিন্দুরা ছিল সংখ্যায় ঢের বেশী। এই বালক সম্রাট প্রথম হইতেই ঠিক করিলেন যে তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রভেদ ঘুচাইয়া দিয়া হিন্দুস্থানের সম্রাট হইবেন। মানুষ কত বড় উঁচু যায়গায় উঠিলে যে এইরূপ ঐক্যের কল্পনা করিতে পারে তাহা হয়ত তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে না। আমাদেয় পক্ষে এক জাত অপর জাতের সঙ্গে বসিয়া খাওয়া কত শক্ত তাহা তোমরা জান। আমার তোমার পক্ষে যাহা

শক্ত কাজ তাহা সম্রাটের পক্ষে শতগুণ কঠিন ব্যাপার, কারণ তিনি ত সাধারণ লোক নন, তিনি যদি ধর্ম্ম অবহেলা করেন তাহা হইলে তাঁহার ধর্ম্মের লোক তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠাকে নষ্ট করিয়া ফেলিবে। তাহা ছাড়া হিন্দু ছিল গোলামের জাত, তাহাদিগের নিকট হইতে নানা উপায়ে টাকা আদায় করা হইত, সেই টাকা আদায় উঠাইয়া দিলে রাজস্বের প্রভূত ক্ষতি হইবে। কোন্ রাজা স্বেচ্ছায় নিজের ক্ষতি করিয়া পরকে আপন করিয়া লয়?

২১ বৎসর বয়সে যখন আমরা বি, এ, এম, এর বই লইয়া মাথা ঘামাইয়া থাকি, তখন আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের নায়কটি তিনটি নিয়ম প্রচার করিলেন, সে তিনটি নিয়ম এইঃ—

১। ভবিষ্যতে যাহারা যুদ্ধে কয়েদী হইবে তাহাদিগকে ক্রীতদাস করিয়া বিক্রয় করা চলিবে না।

২। হিন্দু-তীর্থযাত্রীদের উপর যে কর আদায় করা হইত, তাহা এখন হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

৩। হিন্দু মাত্রই তাহার ধর্ম্মের জন্য জিজিয়া নামক একটী কর সরকারকে দিত, এখন হইতে তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

ইহাতে রাজস্বের যে ক্ষতি হইল তাহা জানিলে বর্ত্তমান কালের যে কোন রাজা হায় হায় করিবে। এই মহানুভব সম্রাট আজীবন যুদ্ধ করিয়া ছিলেন। দিল্লীর চারিপাশের যায়গা লইয়া আরম্ভ করিয়া তিনি পরে সমস্ত হিন্দুস্থানের মালিক হইয়া ছিলেন। তিনি রাজ অন্তঃপুরে তাঁহার হিন্দু স্ত্রীদিগকে মুসলমান বেগমদিগের মতন সমান অধিকার দিয়াছিলেন।

এই সম্রাটের নাম তোমরা কি কেউ জান? ইনি আকবর! হিন্দুগণ "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া ইঁহাকে পূজা করিতেন। ভারতবর্ষে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্রাট কখনও আর কেহ হইয়াছিলেন বলিয়া আমরা জানি না। তিনি হিন্দুস্থানে যে শান্তি স্থাপনা করিয়া গিয়াছিলেন তাহার জন্য তাঁহার বংশধরগণ কয়েক পুরুষ ধরিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারই শাসনবিধি অমান্য করাতে অবশেষে মোগল সাম্রাজ্যের পতন হয়।

আকবরের পিতা হুমায়ুন। তৈমুরলঙ্গ এবং চেঙ্গিজ খাঁ নামক এসিয়ার দুই দানব সম্রাটের বংশে ইনি জন্মিয়াছিলেন। আকবরের মাতার নাম হামিদাবানো, ইনি পারসিক মহিলা। তুর্কী, তাতার ও পারসিকের রক্ত তাঁহার মধ্যে ছিল। সেইজন্য জাতিগত সংকীর্ণতা তাঁহাকে ছুঁইতে পারে নাই। তিনি হিন্দু, মুসলমান ও ক্রিশ্চিয়ান রমণী বিবাহ করিয়াছিলেন, কোনও বিষয়ে তাঁহাকে কোন সংকীর্ণতাই অধিকার করিতে পারে নাই।
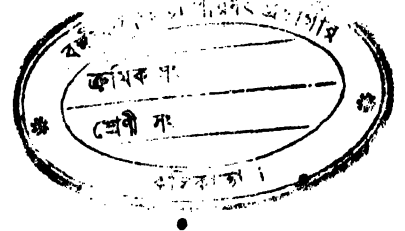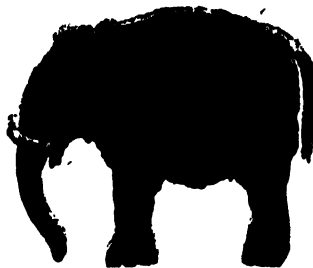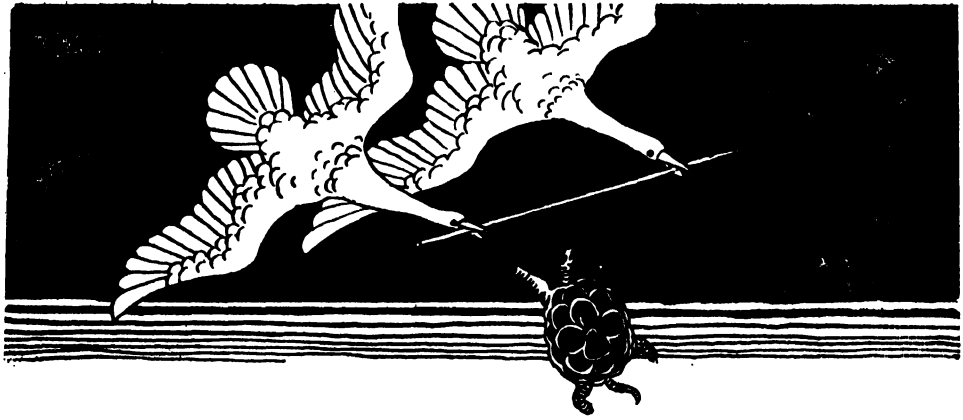
আফিঙের জন্মকথা বা পোস্তমণীর উপাখ্যান।

শ্রীঅপূর্ব্ব ঘোষ।

সে আজ অনেকদিনের কথা। গঙ্গার ধারে তখন এক ঋষি বাস করতেন। তাঁর আর কোন কাজ কর্ম্ম ছিল না, সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত গঙ্গার তীরে বসে বসে কেবলি জপ, তপ, আর ঈশ্বরের আরাধনা করে সময়টা কাটাতেন। তারপর যখন সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ত, তিনি তাঁর আসন কমণ্ডলু গুটিয়ে ধীরে ধীরে ছোট্ট একটী কুঁড়ে ঘরে গিয়ে হোম যাগ করে সমস্ত রাত কাটিয়ে দিতেন। কুঁড়ে ঘরটী তাঁর নিজের হাতে তৈরি। গঙ্গার ধারেই সে কুটীর ছিল—কিন্তু আশে পাশে জনপ্রাণীর আর চিহ্নও ছিল না।

তবু তিনি একেবারেই সঙ্গীহীন একাকী ছিলেন, তা নয়—সেই কুঁড়ে ঘরে আরো একটী প্রাণী থাকৃত—সেটি কে তা জান? সে একটী ছোট্ট ইঁদুর। ঋষি ফল মূল খেয়ে যা ফেলে দিতেন সেইগুলি কুড়িয়ে খেয়ে সে জীবন ধারণ করত।

ঋষি ছিলেন পরম ধার্ম্মিক—কাহাকেও হিংসা করা তাঁর অভ্যাস ছিল না। সুতরাং ইঁদুরেরও কোন ভয় ভাবনা ছিল না—দিব্যি নিশ্চিন্ত আরামে সে খেয়ে খেলে ছুটে বেড়াত। ঋষিকে ভয় করা ত দূরের কথা—সে তাঁর দয়ার পরিচয় পেয়ে একেবারে তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে নিরিবিলি বসে খেলা কর্‌ত।

ঋষি দয়া করে সেই ইঁদুরকে মানুষের মত কথা বল্‌বার শক্তি দিয়েছিলেন—তাতে করে ঋষির এই লাভটুকু হয়েছিল যে সারাদিন জপ্‌তপের পর তিনি তার সঙ্গে গল্প করে বেশ একটু আরাম বোধ করতেন।

এইভাবে দিন যায়—একদিন সন্ধ্যাবেলা ঋষি কুটীরে এসে হাত মুখ ধুয়ে ফলমূল খেয়ে বসে আছেন এমন সময় সেই ইঁদুর সুর্ সুর্ করে তাঁর খুব নিকটে এসে দুহাত জোড় করে বল্‌তে লাগ্‌ল—মুনি ঠাকুর! আপনার দয়ার ত সীমা নেই, দয়া করে আপনি আমাকে কথা বল্‌বার ক্ষমতা দিয়েছেন বলে পশু হ'য়েও

আমি ঠিক মানুষের মতই কথা বল্‌তে পারি। যদি অভয় পাই তা হ'লে আজ একটি নিবেদন আপনার কাছে করতে পারি।

মুনি বল্‌লেন—কি চাও তুমি ?

ইঁদুর বল্‌ল—দিনের বেলা আপনি যখন নদীর ধারে চলে যান তখন একটা বিড়াল কোথা থেকে এসে রোজ রোজ আমাকে ভারি চোখ রাঙায়। আপনার ভয়েই শুধু আমাকে সে ধরতে সাহস করে না, তা নইলে কবেই সে আমাকে ধরে মেরে খেয়ে বসে থাকত। রোজ রোজ চোখ রাঙানী দেখে আমার বড্ড ভয় ভয় করছে—মনে হচ্ছে সে আমাকে শীগ্‌গিরই খেয়ে ফেল্‌বে। তাই প্রার্থনা করছি ঠাকুর, আমার ইঁদুরের চেহারা বদ্‌লিয়ে আমাকে একটা বিড়াল করে দিন।

ইঁদুরের কথা শুনে ঋষির ভারি দয়া হ'ল—তিনি হাতে করে একটু জল নিয়ে মন্ত্র পড়ে ইঁদুরের গায় ছিটিয়ে দিলেন—আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই ইঁদুর প্রকাণ্ড এক বিড়াল হয়ে গেল—কি তার চেহারা, এ্যা লম্বা তার গোঁফ্‌— দেখেই মনে হয় যেন ঠিক বাঘের মাসী! সে তখন ঋষির পায়ের কাছে শুয়ে ম্যাঁও ম্যাঁও ডাক্‌তে সুরু করে দিল।

কিছুদিন যায়—মুনি একদিন রাত্রিবেলা সেই বিড়ালকে ডেকে বল্‌লেন—'পুসী, পুসী—আজকাল কোন নালিশই যে শুন্‌তে পাই না—বেশ স্ফূর্ত্তিতেই আছ বলে মনে হচ্ছে।'

মাথা নেড়ে বিড়াল উত্তর দিল—'না ঠাকুর, স্ফূর্ত্তিতে নয়।' মুনি অবাক হয়ে বল্‌লেন 'কেন ? আমি ত তোমাকে সামান্য বিড়াল করে দিয়েছি তা নয়, পৃথিবীর সব চেয়ে সেরা বিড়াল যে তুমি তোমার সাথে পারে এমন বিড়াল যে পৃথিবীতে আর একটাও নেই।'

বিড়াল বল্‌ল -'হাঁ মুনি ঠাকুর, সে কথা ঠিক—আমি পৃথিবীর কোনো বিড়ালকেই এখন আর গ্রাহ্য করি না বটে, কিন্তু হয়েছে কি জানেন ? এক নূতন শত্রু এসে দেখা দিয়েছে যে! আপনি নদীর ধারে চলে যেতেই একদল কুকুর এসে দাঁত খিঁচিয়ে আমাকে এমনি ধম্‌কাতে সুরু করে দেয় যে তা দেখে ভয়ে আমার প্রাণটাই যেন উড়ে যেতে চায়। আপনি এতই যখন করেছেন, তখন একটীবার আমাকে কুকুর করে দিন দেখি ওদের জব্দ করতে পারি কিনা।'

মুনি বল্‌লেন—'তথাস্তু'। অম্‌নি দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই বিড়াল প্রকাণ্ড এক কুকুর হয়ে গেল।

দিন যায়—সপ্তাহ যায়, একদিন রাত্রিবেলা সেই কুকুর মুনিকে বল্‌ল—'ঠাকুর মশাই, আপনার দয়ার কথা বল্‌ব কত এক মুখে বলে শেষ করা যায় না। ছিলাম ইঁদুর, বল্‌তাম মানুষের মত কথা—হলাম বিড়াল, তাতেও সাধ মিট্‌ল না—হলাম কুকুর ; কিন্তু কি বল্‌ব ঠাকুর মশাই - এই রাক্ষুসে কুকুরের পেট কি আর সহজে ভরতে চায় ? আপনি জানেন না—আমার পেট কেবলি খাই খাই আর চাঁই চাঁই করে। আহা ! ঐ বানরগুলির কি হাসিখুসী মুখ ! ওদের কেমন ভরা ভরা পেট ! সারাদিন গাছে গাছে লাফালাফি, ছুটাছুটি করে বেড়ায়, নানা গাছের ফল, মূল, কচি পাতা খেয়ে সারাদিন কি স্ফূর্ত্তিতেই ওরা সময় কাটায় ! মুনি ঠাকুর দয়া করে যদি আমাকে একটী বানর......... ।'

ভয়ে সে আর কথাই বল্‌তে পার্‌ল না। ঋষি তা'র মনের কথা বুঝতে পেরে মন্ত্র-পড়া জল ছিটিয়ে তাকে এক প্রকাণ্ড হনুমান করে দিলেন। হনুমান খো খো করে লাফিয়ে গিয়ে গাছে চড়্‌ল।

হনুমানের বাঁদ্‌রামী দেখে কে! সে সারাদিন কেবল গাছে গাছে লাফালাফি করে···ডাল ভাঙ্গে—পাতা ছিঁড়ে—তার লেজ আর মাটিতেই পড়ে না!

এম্‌নিভাবে খেয়ে খেলে—লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে দিন যায়। ক্রমে শীত গেল—গ্রীষ্ম এল। রোদের তাপে নদী খাল বিল সব শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে উঠল। বেচারা হনুমানের কষ্ট দেখে কে! সে আর এক ফোটা জলও খেতে পায় না। এমন সময় দেখা গেল একদল জংলী শুকর ডোবার নোংরা ঘোলা জলে দিব্যি আরামে গড়াগড়ি যাচ্ছে—ছুটোপুটি কর্‌ছে। এমন অসহ্য গরম—গাছের পাতা পুড়ে গেছে—পুকুরের জল শুকিয়ে গেছে—কিন্তু ঐ শুকরগুলো ত একটুও কষ্ট পাচ্ছে না। ওদের পরিষ্কার জলের দরকার নেই—ওরা ত নোংরা জলেই দিব্যি আছে।

ঋষি হনুমানের মনের কথা জান্‌তে পেরে তক্ষুনি তাকে শুকর বানিয়ে দিলেন। হনুমান শুকর হ'য়েই ঘোঁৎ করে ডোবায় লাফিয়ে পড়ে কাদামাখা হয়ে দিব্যি পড়ে রইল।

পরদিন সকাল বেলা সেই ডোবার ধার দিয়ে দেশের রাজা প্রকাণ্ড এক হাতীতে চড়ে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। তাই দেখে শুকর ভাব্‌ল—'ওঃ, ঐ হাতীটার কি সৌভাগ্য! এত সব জরী জহরৎ, মনি অলঙ্কারে তার এত বড় শরীরটা ঢাকা পড়ে গেছে! লক্ষ টাকার কম কিছুতেই হবে না ঐ সব অলঙ্কারের দাম! শুধু কি তাই?—দেশের রাজাকে সে নিজের পিঠে চড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে—উঃ! কত বড় সৌভাগ্য তা'র! হায়! এম্‌নি একটা হাতী হ'য়ে যদি জন্মাতে পারতুম্‌!'

ঋষির নিকট রাত্রে প্রার্থনা জানান হ'ল। ঋষি খুসী হ'য়েই তাকে এক প্রকাণ্ড হাতী করে দিলেন। হাতী তখন ছুটে গেল সেই বনের ধারে যেখানে রাজা হরিণ শিকার করতে যান। রাজা শিকার করতে গিয়ে দেখেন সুন্দর একটা হাতী ঘুরে ঘুরে কেবলি তাঁর পাশ দিয়ে আসা যাওয়া করছে। রাজা সেটাকে বেঁধে ফেল্‌বার জন্য মাহুতকে হুকুম দিলেন। সবাই মনে করে ছিল জংলী হাতী—ওটাকে বন্দী করতে না জানি কতই বেগ পেতে হ'বে। কিন্তু হাতী ভাবছিল—কখন আমাকে ধরে রাজবাড়ী নিয়ে যাবে। সুতরাং মাহুৎ যখন দড়ি নিয়ে বাঁধতে গেল, হাতী নিজেই এসে ধরা দিয়ে নেচে নেচে রাজপ্রাসাদে হাতী-শালের দিকে ছুটে চল্‌ল।

ঘোড়াশালে ঘোড়া···হাতীশালে হাতী···খায় দায় ঘুমায়। একদিন রাণীর ইচ্ছা হ'ল হাতীতে চড়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাবেন। শুনে রাজাও বললেন—আমি তোমার সঙ্গে যাব।

হুকুম গেল হাতীশালে—জমকাল সাজে দুটো হাতীকে সাজিয়ে মাহুত রাজবাড়ীর অন্দর মহলের দ্বারে নিয়ে হাজির কর্‌ল। রাজারাণী পোষাক পরে বেরিয়ে এলেন। নূতন হাতীটা দেখ্‌তে যেমন সুন্দর ছিল, পোষাকে অলঙ্কারে তাকে আজ আরো চমৎকার দেখাচ্ছিল। রাণী বল্‌লেন—আমি 'চড়্‌বো' সুন্দর হাতীতে।

রাজারাণী হাতীতে চড়ে গঙ্গার ধারে চলেছেন—ধীরে ধীরে হাওয়া সেবন করে। ওদিকে নূতন হাতীটা করেছে কি—ধেই ধেই করে লাফাতে সুরু করে দিয়েছে! ওর প্রথম থেকেই মনে মনে রাগ জমে উঠ্‌ছিল। সে ভেবেছিল রাজবাড়ী এসেছে স্বয়ং মহারাজ তা'র পিঠে চড়বেন; কিন্তু কই—তার পিঠে চড়ে বসেছে কিনা রাণী—একটা মেয়ে মানুষ! তাই তা'র রাণীর উপর এমন রাগ হয়েছে যে লাফিয়ে ঝাপিয়ে রাণীও মাহুৎকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে তুলেছে। মাহুৎ কিছুতেই পারছে না হাতীটাকে শান্ত করতে—রাণীও কিছুতেই পারছে না ঠিক হয়ে হাতীর পিঠে বসে থাক্‌তে। শেষকালে চোট সাম্‌লাতে না পেরে, রাণী একেবারে ধপাস্ করে মাটিতে চিৎপাৎ!

রাজা ছুটে এসে রাণীকে হাত ধরে তুল্‌লেন—রুমাল দিয়ে মুখ হাত মুছিয়ে দিলেন—ধূলো ঝেড়ে কত আদর কত যত্ন করলেন। এসব দেখে হাতী ভাব্‌ল—বটে! এত আদর? আমি যাকে ঘৃণা করে পিঠ থেকে ফেলে দিলুম সেই রাণীর এ-ত যত্ন? হায়! এত সৌভাগ্য যা'র সে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে সব চেয়ে সুখী। আমার কি তেমন সৌভাগ্য হবে? আচ্ছা দেখা যাক—মুনি ঠাকুরকে আরেকবার বলে দেখ্‌ব!

এই না ভেবে সেদিন সন্ধ্যার সময় হাতী ছুটে গিয়ে বন পেরিয়ে, নদীর ধারে সেই ঋষির কুটীরে গিয়ে উপস্থিত। ঋষি তাকে দেখেই ত একেবারে অবাক্। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপার কি! রাজার ওখানেও মন উঠ্‌ল না? রাজবাড়ী ছেড়ে চলে এলে যে?

হাতী ঋষির পায়ের তলায় লম্বা হয়ে পড়ে বল্‌তে লাগ্‌ল—কি আর বল্‌ব ঠাকুর, আপনি দয়া করতে ত আর কম করলেন না—আমি যখন যা ইচ্ছা করেছি আপনি তখনি তা পূর্ণ করেছেন। কিন্তু আর একটীবার আমার সাধ পূর্ণ করতে হবে—তবেই হ'ল—আর আমি কোনদিন কিছু চাইব না। আপনার বরে আমি হাতী হয়েছি বটে, কিন্তু তা'তে করে আমার শরীরটাই শুধু মোটা এবং ভারী হয়ে উঠেছে—আমার সুখ শান্তি ত একটুও বাড়ে নি। আমার মনে হচ্ছে পৃথিবীতে যদি কেউ সুখী থেকে থাকে তবে ঐ—রাণী। ওগো ঠাকুর! একটীবার দয়া করে আমায় এক রাজরাণী করে দিন।

ঋষি বল্‌লেন—আরে হতভাগা! তোর আশার বুঝি আর শেষ নেই? কিন্তু আমি তোকে রাণী করব কেমন করে? একটা রাজ্য চাই—একজন রাজা চাই—তবে ত রাণী হওয়া চলে। আচ্ছা—এক কাজ করা যাক্—তোকে খুব সুন্দর একটী মেয়ে মানুষ করে দেখি—কোনোদিন যদি কোনো রাজার নজরে পড়িস্ তবেই তোর আকাঙ্খা পূর্ণ হবে—কেমন?

হাতী তাতেই রাজী হল। ঋষি তাকে সুন্দর একটী মেয়ে হবার মন্ত্র পড়ে জল ছিটিয়ে দিলেন—দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই ভীষণ মোটা কালো হাতীর শরীরটা কোথায় মিলিয়ে গেল! আর সেইখানে রইল ছোট্ট একটী মেয়ে—টুক টুকে তার মুখ—ফুট্‌ ফুটে তার চোখ—ধব্‌ধবে শাদা কুন্দ ফুলের মত তার গায়ের রং! ঋষি তা'র নাম রাখলেন—পোস্তমণী!

পোস্তমণী ঋষির কাছেই থাকে—গাছে জল দেয়—ফুল পাড়ে—ফল খায়—গঙ্গার জলে সাঁতার

কাটে; সন্ধ্যাবেলা ঋষির পূজার ঘরে ধূপ দেয়—দীপ জ্বালে—এই ভাবে তা'র দিন কাটে। একদিন সে দোরগোড়ায় চুপ্‌টী মেরে বসে আছে—ঋষি তখন ঘরে নেই—এমন সময় খুব জম্‌কাল পোষাকপরা এক রাজপুত্র সেইখানে এসে উপস্থিত।

পোস্তমণী তাঁকে জিজ্ঞাসা করল—আপনি কে? কি জন্যই বা এই বনের ভিতর একাকী এসেছেন?

রাজকুমার বলল—শিকার করতে বেরিয়ে এক হরিণকে তাড়া করে ছুট্‌তে ছুট্‌তে বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তাই একটু জল খেতে এই কুটীর দেখ্‌তে পেয়ে এখানে এসেছি।

পোস্তমণী বলল—আপনি বিশ্রাম করুন—জল এনে দিচ্ছি।

পোস্তমণী একঘড়া জল এনে রাজপুত্রের পা ধুইয়ে দিতে গেল—রাজপুত্র লাফিয়ে উঠে বল্‌ল—ওকি কর! আমি হ'লাম ক্ষত্রীয়, আর তুমি হ'লে ঋষির কন্যা—তুমি ত আমার পা ছুঁতেই পার না।

পোস্তমণী বল্‌ল—আমি ত ঋষির কন্যা নই। তা ছাড়া আপনি যখন আজ আমার অতিথি হয়ে এসেছেন তখন আপনার পা ধুইয়ে দিতে কোন আপত্তি থাক্‌তে পারে না। আর এ কথাও জেনে রাখুন—আমি ব্রাহ্মণ কন্যাও নই।

রাজপুত্র অবাক্ হ'য়ে বল্‌ল—তুমি ঋষির মেয়েও নও—ব্রাহ্মণ কন্যাও নও! তা হ'লে তুমি কা'র মেয়ে? তোমার বংশ পরিচয় না দিলে আমি তোমার আতিথ্য গ্রহণ করব না।

পোস্তমণী তখন বলল—ঋষির কাছে শুনেছি আমার মা বাবা দুজনই ক্ষত্রীয় ছিলেন!

রাজপুত্র বল্‌ল—তোমার বাবা কি তবে রাজা ছিলেন? তোমাকে দেখে ত রাজকন্যা বলেই মনে হচ্ছে।

পোস্তমণী সে কথার কোন জবাব না দিয়েই ঘরের ভিতর চলে গেল এবং একটী রেকাবী করে নানা রকম মিষ্ট ফল এনে রাজার কাছে রেখে খেতে অনুরোধ করতে লাগ্‌ল। রাজপুত্র বল্‌ল—আমার কথার জবাব না দিলে আমি কিছুতেই এ ফল গ্রহণ করব না।

পোস্তমণী তখন বাধ্য হয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল—ঋষির কাছে শুনেছি আমার পিতা একজন রাজা ছিলেন। কোনো এক যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে মনের দুঃখে তিনি বনে চলে যান। সেই সঙ্গে মাও গিয়েছিলেন। কিন্তু বেশী দিন তাঁ'রা জীবিত ছিলেন না। সেই বনে বাঘের মুখে বাবার প্রাণ গেল। মায়ের তখন দশ মাস। আমি যেদিন পৃথিবীতে এসে চোখ চাইলুম, মা সেদিন চিরকালের তরে চোখ বুজে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। মা বাবা মারা গেলেন, কিন্তু বিধাতা আমার বাঁচবার এক আশ্চর্য্য উপায় করে দিলেন। আমি যেখানে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলুম ঠিক সেখানে আমার মাথার উপরেই একটা গাছের ডালে সুন্দর একটী মৌচাক ছিল—সেই মৌচাক থেকে টস্ টস্ করে মধু এসে আমার মুখে পড়্‌ত—আমি তাই খেয়ে খেয়ে বেঁচে রইলুম। শেষে একদিন এই ঋষি আমায় দেখ্‌তে পেয়ে কুড়িয়ে এনে পাল্‌তে লাগ্‌লেন। সেই থেকে আমি এখানেই আছি।

রাজপুত্র কিন্তু প্রথম থেকেই এই কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি পরিচয় পেয়ে আর দেরী কর্‌লেন না—তাড়াতাড়ি রাজধানীতে নিয়ে গিয়ে মেয়েটীকে বিয়ে করে একেবারে সিংহাসনে নিজের পাশে বসিয়ে দিলেন।

সেই পোস্তমণী—ছিল বনের ধারে ছোট্ট কুটীরে—আর এখন সে এসেছে রাজপ্রাসাদে—বসেছে সিংহাসনে—রাজার পাশে—রাজরাণী হয়ে। মাথা তার ঠিক থাক্‌তে কি পারে? তার মেজাজ হয়ে গেল ভারি কড়া—ভারি কন্ কনে!

গন্ধ তৈল মাথায় দেয়, গোলাপ জলে স্নান করে—শতেক দাসীতে হাওয়া করে—কিন্তু মাথা তার কিছুতেই ঠাণ্ডা হয় না। কি উপায় হবে! রাজা ভেবে আকুল—মন্ত্রী একেবারে ভ্যাবাচাকা! রাণীর একি উৎকট ব্যাধি হ'ল! কোনো বৈদ্যই এই ব্যাধির ঔষধ জানেনা—আশ্চর্য্য!

একদিন কিন্তু সব চিন্তা দূর হয়ে গেল—সেদিন গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় আকাশে প্রকাণ্ড চাঁদ উঠেছে গরমে রাণী কিছুতেই আর ঘরে থাক্‌তে না পেরে বাগানে বেরিয়ে পড়্‌লেন। ফুরফুরে হাওয়া—ফুট্ ফুটে জ্যোৎস্না! রাণী আপন মনে বেড়াতে বেড়াতে বাগানের একধারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে ছিল একটা প্রকাণ্ড কূপ—সেই কূপের ধারে গিয়ে দাঁড়াতেই তাঁর মাথাটা কেমন বন্ বন্—গা'টা কেমন ছম্ ছম্ করে উঠ্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মাথা ঘুরে তিনি সেই কূপের ভিতর পড়ে গেলেন।

রাজা খবর পেয়ে পাগলের মত হয়ে ছুটে এলেন সেই কূপের ধারে। কেমন করে রাণীকে বাঁচাবেন তারই চেষ্টায় কি যে করবেন কিছুই ঠিক করে উঠ্‌তে পারলেন না। এমন সময় সেই ঋষি এসে উপস্থিত সেই কূপের ধারে! কেমন করে খবর পেলেন—কি করেই বা সেখানে উপস্থিত হ'লেন তা কেউ বল্‌তে পারে না।

ঋষি এসেই রাজাকে বল্‌লেন—মহারাজ! যা হ'বার তা হ'য়ে গেছে—সে জন্য আর দুঃখ করবেন না। ভাগ্য খণ্ডাবে কে? আপনি যা'কে রাজার মেয়ে মনে করে রাণী করেছিলেন, সেত কোন রাজকন্যা ছিল না—সে ছিল একটা ইঁ-দু-র! আমারি বরে সে ইঁদুর থেকে বিড়াল, বিড়াল থেকে কুকুর, কুকুর থেকে হনুমান, হনুমান থেকে শুকর, শুকর থেকে হাতী এবং হাতী থেকে সেই কন্যা হয়ে শেষকালে আপনার রাণী পর্য্যন্ত হয়েছিল! সে যখন আর নেই তখন তা'র জন্য আর দুঃখ করে লাভ কি? তবে আমার একটা ইচ্ছা আছে—এই মেয়েটীর নাম যা'তে চিরকাল পৃথিবীতে থেকে যায় তার একটা উপায় ঠিক করেছি। আপনি কূপ্ থেকে আর তা'কে তুল্‌বেন না—মাটি দিয়ে সেটা একদম্ বন্ধ করে দিতে হবে। সেই মাটি থেকে একটা গাছ উঠ্‌বে—তা'কে সবাই বল্‌বে পোস্তগাছ। সেই গাছ থেকে একরকম কস্ বের হবে—সে কসের নাম হবে আফিঙ্। যে সেই আফিঙ্ খাবে সে হবে আফিঙ্ খোর! আর সেই আফিঙখোরের স্বভাব হবে—ইঁদুরের মত অনিষ্টকারী, বিড়ালের মত দুধখোর, কুকুরের ন্যায় ঝগড়াটে, হনুমানের মত নোংরা, শুকরের মত জংলী, হাতীর মত হোঁৎকা এবং এই পাটরাণীর মত গরম মেজাজী!

—*—*—

পল্লীর বুকে

[শ্রী—বড়দাদা]

জল ঝড় মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে; আর এই দুর্য্যোগেই চাষাদের ছেলে বুড়া আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে মাঠে চলিল। হাতে ছাতি নাই;—পায়ে জুতা নাই;—গায়ে জামা নাই। সাত হাত কাপড়ে মালকোচা মারিয়া—আর একটী বড় গামছায় মাথা জড়াইয়া তাহারা ছুটিতেছে। তাহাদের সকলকার আগে—ঐ যে দোহারা, বেঁটে, প্রৌঢ় লোকটী কুড়ি বছরের যুবকের অপেক্ষা মহা উৎসাহে ছুটিতেছে;—ওকে চেন? ঐ সব চাষাদেরই মোড়ল গোছের—তাদেরই কারও খুড়া বা জ্যেঠা হইবে—কেমন? তোমরা তা হলে উহার পরিচয় জান না। এ অঞ্চলের প্রত্যেক কৃষক—আশী বছরের বুড়াই হোক—আর দশ বার বছরের বালকই হউক, উহাকে আপনাদের সব চেয়ে নিকট আত্মীয়ের মত ভালবাসে—গুরুর মত ভক্তি করে—পিতার মত শ্রদ্ধা করে! কিন্তু আমি যখন বলিতেছি—ও ব্যক্তিটী ব্রাহ্মণ—কলিকাতার মেডিকেল কলেজের সব চেয়ে সেরা ছাত্র—বরাবর ছেলেবেলা হইতে বৃত্তি পাইয়া বৃত্তির টাকাতেই লেখা পড়া শিখিয়াছে—তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস করিবে কি? প্রমাণ? না, প্রমাণ দিবার আমার বেশী কিছু নাই। তার ছোট কুঁড়েটার এক জায়গায় খান দশেক ডাক্তারী বই, আর এক আলমারী ভরা ঔষধ আছে দেখিয়াছি—আর যখনই পাড়ার মধ্যে ভদ্র—অভদ্র, বড়লোক—ছোটলোক, কাহারও বাড়ীতে কেহ অসুখে পড়িয়াছে তখনই সে ছুটিয়াছে। সেদিন সমস্ত রাত্রিটা সে কৃত্তিবাস মোড়লের ছেলের পাশে বসিয়া কাটাইয়া দিল—কলেরার বিভীষিকা তাহাকে ভয়ে বশীভূত করিয়া তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ করাইতে পারিল না।

এমন ত কত হয়। দিন নাই—রাত নাই—সে কাহারও না কাহারও কাজে লাগিয়াই আছে। আর যখন হাতে ও রকম কাজ না থাকে, চাষাদের সঙ্গে মাটী কোপায়—সার দেয়—নয়ত ফসল কাটে। একটা নৈশ বিদ্যালয় খুলিয়াছে। সেখানে লেখা পড়া শিখাইয়া আর দেশ বিদেশের ইতিহাস হইতে বড় বড় উদাহরণ দিয়া ছেলেদের সে একটা নূতন দিকে—নূতন আলোর সন্ধানে লইয়া চলিতেছে। তাহাদের প্রত্যেকে যেন একটা নূতন উদ্যমে তাহার পথের অনুসরণ করিতেছে। কৃষি বিষয়ের ক'খানা বইও তাহার কাছে দেখিবে। এক কথায় বল—তোমরা যদি তিনটী দিন থাক—সব দেখিয়া শুনিয়া স্বীকার করিবে ঐ লোকটী আপনার শিক্ষার ওজনে গুরুভার বৈদেশিকবুলি কথার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ-না করিয়াও—টম টম, বায়স্কোপ, থিয়েটার, এরোপ্লেনের খবর না রাখিয়াও এই দশ বৎসরের মধ্যে পল্লীমায়ের ঘুমন্ত শিশুকে জাগাইয়া দিয়াছে। ছেলে বুড়া সকলেরই দিন যাপনের ধারাটাই বদলাইয়া দিয়াছে। তাহাদের বুক ভরিয়া দিয়াছে—নূতন উৎসাহের উদ্দীপনায়!
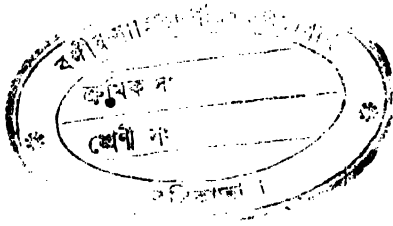
অতুলনীয় অট্টালিকা

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশ গুপ্ত, এম্, এ]

দেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষ, চারিদিকে হাহাকার, দলে দলে প্রজা এসে রাজার কাছে প্রাণের বেদনা জানাচ্ছে। রাজার সেদিকে লক্ষ্য নাই, প্রজারা মর্‌ছে, কেউ না খেয়ে, কেউ অখাদ্য খেয়ে রোগের জ্বালায়, রাজা সেদিকে ফিরেও চাইছেন না। রাজা বলছেন, "অর্থ চাই, অর্থ চাই, তোমরা দুঃখভোগ করছ, দুঃখ সইবার জন্যই ত তোমাদের জন্ম, তোমরা না খেয়ে মরছ, তোমাদের অদৃষ্ট। অর্থ চাই, আমি পৃথিবীতে একটা অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে যেতে চাই, তোমাদের তারই জন্য টাকা যোগান চাই।" প্রজার ঘরে অর্থ নাই, কিন্তু রাজার প্রাপ্য পূর্ণ উদ্যমে আদায় হচ্ছে।

একদিন রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বল্‌লেন, 'মন্ত্রী, এমন একটা অট্টালিকা তৈরী কর্‌তে হবে, যেমন সুন্দর অট্টালিকা পৃথিবীতে কেউ কখন দেখে নি, তার জন্য যত অর্থ প্রয়োজন হয় খরচ কর।" কোষাধ্যক্ষের প্রতি আদেশ হল, মন্ত্রী যখন যে অর্থ চাইবে রাজকোষ উজাড় করে তা দিতে হবে।

এক মাস যায়, দুই মাস যায়, রাজা জিজ্ঞাসা করেন, 'মন্ত্রী! অট্টালিকা?" মন্ত্রী উত্তর করেন, 'মহারাজ, আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন।"

ক্রমে দেশে দুর্ভিক্ষ নিবারিত হল, প্রজার গৃহে হাসি ফিরে এল, মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ, এইবার আমার অট্টালিকা তৈরী হয়েছে।"

"তৈরী হয়েছে! বল কি মন্ত্রী! চল, দেখে আসি।"

মন্ত্রী বললেন, "দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় অনাহারে যারা মরছিল, রাজকোষের অর্থ দিয়ে বিদেশ থেকে তাদের জন্য অন্ন এনেছি, রোগে অচিকিৎসায় যারা মরছিল, আপনার অর্থে তাদের চিকিৎসা হয়েছে, শুশ্রূষা হয়েছে। মহারাজ, এরই পুরস্কারস্বরূপ স্বর্গরাজ্যে আপনার বাসের জন্য যে অট্টালিকা তৈরী হয়েছে, পৃথিবীতে তেমন অট্টালিকা কেউ কখন দেখেনি।"

———

কে ওস্তাদ?

(শ্রীঅপূর্ব্ব ঘোষ।)
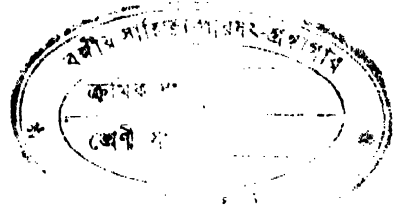
পেটেন্ট ওষুধ-ওয়ালা সহরে খুব বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে, রাস্তায়, ঘাটে, রেলে, ষ্টীমারে, হোটেলে, থিয়েটারে, বায়স্কোপে বিস্তর বিজ্ঞাপন বিলি করে, খুব বড় একটা রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ী করে' চমৎকার দোকান সাজিয়ে বসে আছে। দরজায় প্রকাণ্ড কাঁচের পর্দ্দা—তার আড়ালে বড় বড় কাঁচের ফুলকাটা বোতলে লাল নীল জল রয়েছে। দিনের বেলা রোদের আলো পড়ে' সেগুলি জ্বল জ্বল করে ওঠে, সন্ধ্যা বেলা বিদ্যুতের আলো দিয়ে সে গুলিকে ঝল্‌সিয়ে তোলা হয়। সহরের লোক ঐ দোকান থেকেই ওষুধ কিনে আনে, পাড়াগাঁ থেকে যারা সহরে আসে তা'রা ঐ দোকানের সাম্‌নে গিয়ে অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে আর মনে মনে ভাবে—লাখটাকা পুঁজি না নিয়ে কি আর এমন দোকান দেওয়া যায়? দোকানদার না জানি কত টাকাই জমিয়েছে!

সেদিন ছিল রবিবার। সকাল বেলা চা, বিস্কুট খেয়ে একটা মোটা বর্ম্মা সিগার মুখে দিয়ে পেটেন্ট-ওষুধ-ওয়ালা দোকানের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে রাস্তায় লোক চলাচল দেখ্‌ছিলেন, এমন সময় মেডিক্যাল কলেজের পাশকরা এক ডাক্তার সেই দোকানে এসে পেটেন্ট-ওষুধ-ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'হাঁ ভাই, তুমি ত ইস্কুল কলেজে পড়নি, কোনো ডিগ্রিও তোমার নেই, ডাক্তারী বিদ্যারও বিন্দু বিসর্গ তুমি জান না, তবু তুমি এমন ষ্টাইল করে বড় লোকী চালে কেমন করে চল্‌তে পার তাত বুঝে উঠ্‌তে পারি না। সহরে তোমার এ্যা বড় পাঁচতলা দালান, দাসদাসী, দরোয়ান, মালী, জুরীগাড়ী, মোটরকার—তারপর আবার বেলঘরিয়াতে একটা বাগান বাড়ীও নাকি করেছ শুন্‌তে পাই! আমি প্র্যাক্‌টিস্ করি মফঃস্বলে মেদিনীপুর জেলায়, মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশও করেছি—বড় বড় মোটা মোটা বই পড়ে খুব পণ্ডিতও হয়েছি, কিন্তু ভাই, তবু আমার কপালে দুবেলা দুটী অন্ন জুটবে তেমন পয়সাও যে আমার ঘরে আসে না, এর কারণটা কি তুমি আমায় বল্‌তে পার?'

পেটেন্ট-ওষুধ-ওয়ালা মুখ থেকে সিগারটা নামিয়ে একরাশ ধোঁয়া ভোঁস ভোঁস করে নাকমুখ দিয়ে বের করে দিয়ে, কোমরে হাত রেখে একটু মুচ্‌কি হেসে লাঠিতে ভর দিয়ে গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়ে আগন্তুক ডাক্তার বাবুকে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত বেশ করে দেখে নিলেন। তারপর রাস্তার দিকে হাত দেখিয়ে বল্লেন—'আচ্ছা ডাক্তার বাবু, রাস্তার দিকে চেয়ে থাকুন—কি দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

লোকের পর লোক—কেউ চল্‌ছে, কেউ ছুট্‌ছে, কেউ হেসে গল্প করে যাচ্ছে কেউ আপন মনে শিস্ দিতে দিতে চলেছে।

আচ্ছা, আমরা এখানে যতক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বল্‌ছি, এর ভিতর ঐ রাস্তা দিয়ে ক'জন লোক চলে গেছে তা অনুমান করতে পারেন?

হাঁ, এই প্রায় একশ জন হবে।

আচ্ছা, ঐ একশ জনের ভিতর বেশ পাকা বুদ্ধি আছে এমন ক'জন হবে তা বল্‌তে পারেন?

মাথা চুল্‌কিয়ে, আম্‌তা আম্‌তা ডাক্তার বাবু বল্লেন—বড় জোর একজন।
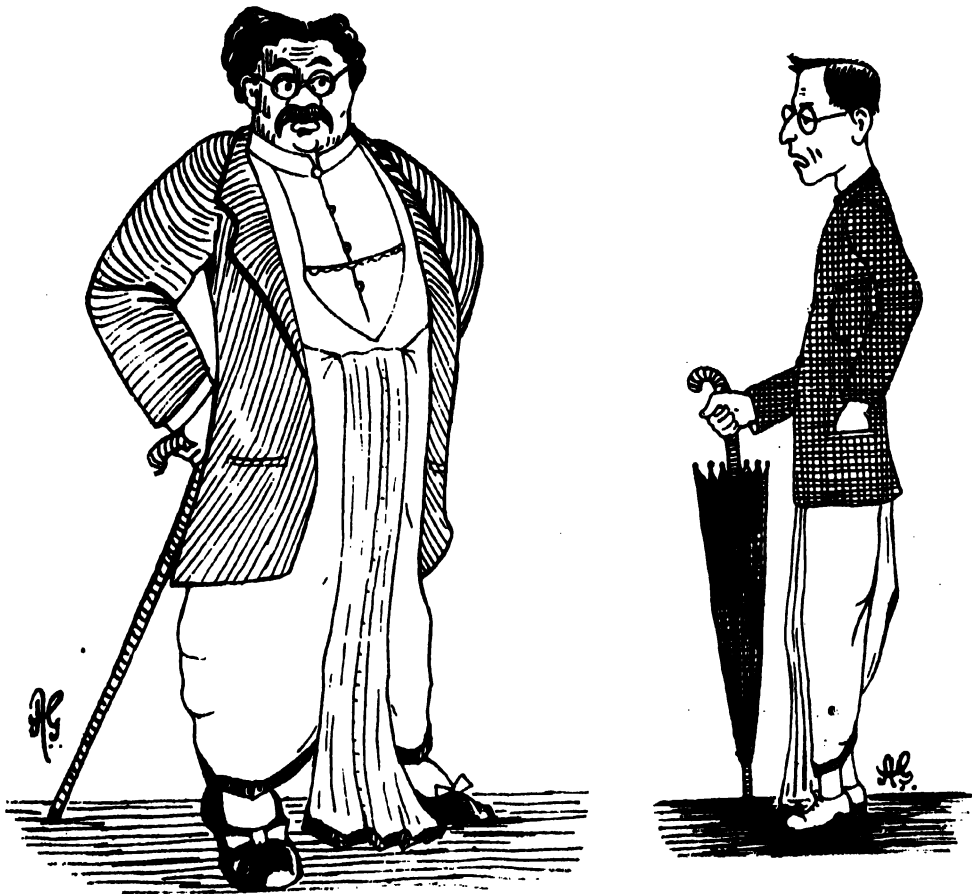
তখন সেই সেয়ানা দোকানদার চোখে মুখে একটা গর্ব্বের ভাব প্রকাশ করে বিনিয়ে বিনিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন—'ঠিক বলেছেন ডাক্তার বাবু, একজনই বটে! ঐ একজন লোকই যায় আপনার নিকট, আর বাকী নিরনব্বই জনের ভার নিতে হয় আমাকে। তা'হলেই বুঝতে পারছেন কারণটা কি?'

ডাক্তার বাবু কোন জবাবই দিতে পারলেন না। তাঁর বুদ্ধি সুদ্ধি হঠাৎ যেন লোপ পেয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা তুলে চেয়ে দেখ্‌তে পেলেন ইয়া বড় পাগড়ী মাথায় এক ভোজপুরী দরোয়ান সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছে—হাতে একখানা জার্ম্মান সিল্‌ভারের কাজকরা থালায় ছোট্ট একটী ভিজিটিং কার্ড।

কার্ডখানা বাঁ হাতে তুলে নিয়ে পেটেণ্ট-ওষুধ-ওয়ালা পড়ে বল্‌লেন আসাম জিলাকা বড়া সাব্‌ আয়া! মেরা খাস কামরামে উন্‌কো লে যাও।

এসব ব্যাপার দেখে ডাক্তার বাবুর চোখ একেবারে চড়ক গাছ! তিনি সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারলেন না। মাথা নীচু করে চুপচাপ রাস্তায় বেরিয়ে এসে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন—বাবাঃ! ডাক্তারী জানে না ঠিক, কিন্তু বেটা আচ্ছা সেয়ানা বটে! ব্যবসায়ীবুদ্ধি যদি কারে থেকে থাকে তবে এই পেটেণ্ট-ওষুধ-ওয়ালার!

শিল্প-প্রদর্শনীর ছবি।

(শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার)

তোমাদের মধ্যে যাহারা সহরে থাক না তাহারা হয়ত শিল্প-প্রদর্শনীর কথাই জান না। কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের একটি চিত্র-বিদ্যালয় আছে, চিত্র অঙ্কন বিদ্যা সেখানে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। গত তিন বৎসর সেই স্কুলে ফি বছরের শেষে একটি করিয়া প্রদর্শনী বসে। এই প্রদর্শনীতে ভারতবর্ষের সকল দেশ হইতেই চিত্রকরগণ তাঁহাদের আঁকা ভাল ভাল ছবি পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। কলিকাতার জন কয়েক নামজাদা চিত্রকর উপস্থিত থাকিয়া সেই ছবি গুলি স্কুলের তিন চারটি বড় বড় ঘরের দেওয়ালে টাঙাইয়া দেন; কোন্ ছবি গুণে প্রথম, দ্বিতীয়, তাহার বিচার করেন; পুরষ্কার, পদক এসকল দেন; আবার যে ছবিগুলি পুরষ্কার বা পদক পায় না, অথচ ভাল, তাহাদের প্রশংসা পত্র দেন। তারপর একদিন তাঁহারা লাট সাহেবকে প্রদর্শনী খুলিবার জন্য নিমন্ত্রণ দিয়া আনেন, লাট সাহেব প্রদর্শনী খুলিয়া দিয়া যান।

দোটানা

প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ভারতের সর্ব্বত্র যে সকল শিল্পীর শিল্প ছড়াইয়া আছে তাহা এক যায়গায় জড় করিয়া দেশের লোককে দেখান; ও দেশের সম্মুখে গুণীকে আদর দেওয়া; ছবি কেনা, ঘরে রাখা যাঁহাদের সখ তাঁহাদের ছবি বাছিয়া কিনিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া।

তোমার হয়ত একখানি খুব ভাল ছবি কিনিবার ইচ্ছা, কলিকাতা সহরে যে দুই তিনটী শিল্পীর নাম তুমি জান, তাঁহাদের ছবি হয়ত তোমার ভাল লাগে নাই, তাহার চেয়ে ভাল পাইলে তুমি লও—তোমার যদি জানা থাকে যে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে শিল্প-প্রদর্শনী হয়, সেখানে সব দেশ হইতে ছবি আসে, তুমি সেখানে গিয়া ছবি পছন্দ করিয়া আসিতে পার, কিনিতেও পার।

এ বছর ডিসেম্বরের শেষে মিউজিউম সংলগ্ন গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে চিত্র-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। বঙ্গের শাসনকর্ত্তা মাননীয় লর্ড লেটন মহোদয় প্রদর্শনীর দ্বার খুলিয়াছিলেন। আমরা প্রদর্শনী দেখিতে

গিয়াছিলাম। সেখানে অনেক ভাল ভাল চিত্রও দেখিলাম। তখন কেবল তোমাদের কথাই আমার মনে হইতেছিল, যদি আমার এই ভাই-বোনগুলির হাত ধরিয়া প্রদর্শনীতে লইয়া যাইতে পারিতাম, তবেই যেন আমার তৃপ্তি হইত। কিন্তু তাহা ত আর সম্ভব নয়! আমরা একজিবিসন হইতে কতকগুলি চিত্রের প্রতিচিত্র তুলিয়া আনিয়াছি, তাহারই কতকগুলি তোমাদের উপহার দিতেছি। যদি তোমরা ভবিষ্যতে কলিকাতায় আস ও সুবিধা করিতে পার, শিল্প-প্রদর্শনীটা একবার করিয়া দেখিয়া যাইও। ডিসেম্বরেব শেষে প্রদর্শনী বসে—মনে থাকিবে ত?

এ বছরের প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে ঐ ছবি খানি। ছবি খানি শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর আঁকা। ছবির নামটি দোটানা। সে দেবতার পূজা দিতে যাইতেছে, সংসারের দিকেও মন টানিতেছে—ভাবটা ছবিতে এইরূপই ফুটিয়াছে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন একজন সুবিখ্যাত চিত্রকর। তাঁহার অঙ্কিত বহু চিত্র প্রদর্শনীতে ছিল। কয়েকখানির প্রতিচিত্র দেখ। এই খানির নাম বিদ্যুৎ। নিবিড় নীলের কোলে বিদ্যুৎ নামিয়া আসিতেছে। ঠিক লক্ষ্য করিয়া দেখিলে নিশীথ রাতের আকাশে বিদ্যুৎ খেলাই মনে হয় না কি?
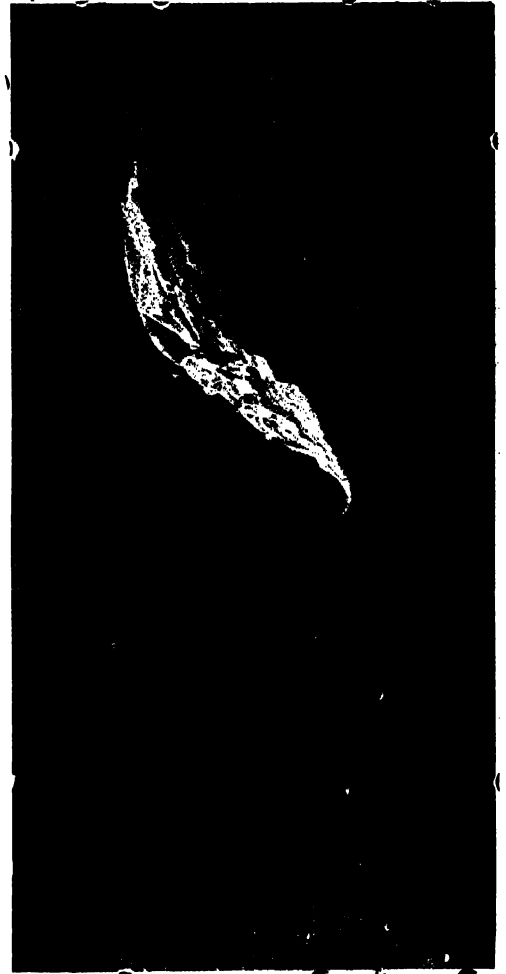
বিদ্যুৎ

তাঁর আর একখানি চিত্র—নৃত্য! বাপ বাঁশী বাজাইতেছে, মা'র হাতে খঞ্জনী—শিশু কেমন নাচিতেছে দেখ!

নৃত্য

আচ্ছা এই যে নীচের ছবিখানা এটা কি তোমাদেরই কাহারো ছবি নয়—ঠিক করিয়া বল দেখি? আমার ত মনে হইতেছে, তোমাদেরই একজন গচ্চা মারিতেছে আর একজন তাহাই নিবিষ্ট চিত্তে দেখিতেছ! ছবিখানি একজন তরুণ শিল্পীর আঁকা তাঁর নাম শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ কর্ম্মকার।

লাট্টু খেলা
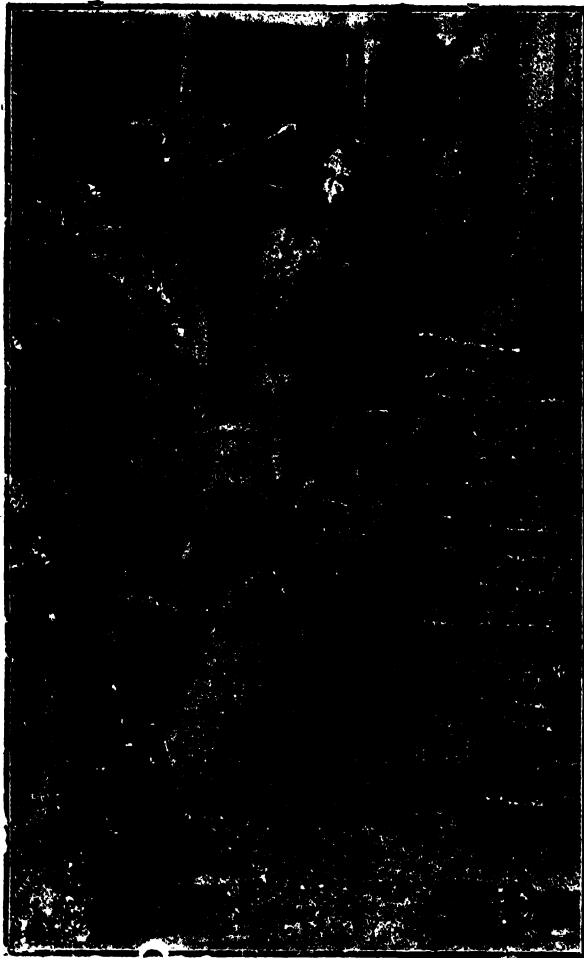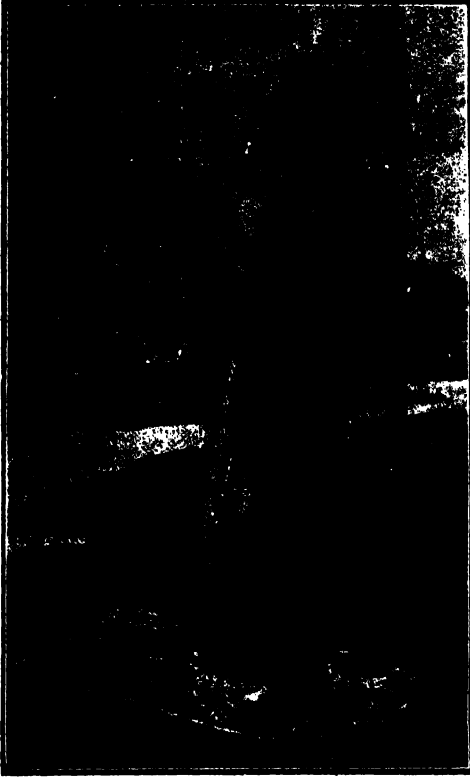
নমাজ

পথে ঘাটে তোমরা এ দৃশ্য নিশ্চয়ই দেখিয়াছ! হিন্দুরা এমনি নিয়মিত দেবারাধনা করুক আর নাই করুক, মুসলমান দিনান্তে একটিবার নমাজ করিবেই, যত কাজে ব্যস্ত থাক যত দুঃখে থাক, সুখে থাক, দিন শেষের কাজ কখনই ভুলে না।

চিত্র দেখ! শিল্পী সন্ধ্যার ভাবই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রদীপের আলোক আছে, তবুও অন্ধকার পৃথিবীর চক্ষু তখন মুদ্রিত, কারণ সূর্য্যই পৃথিবীর চক্ষু!
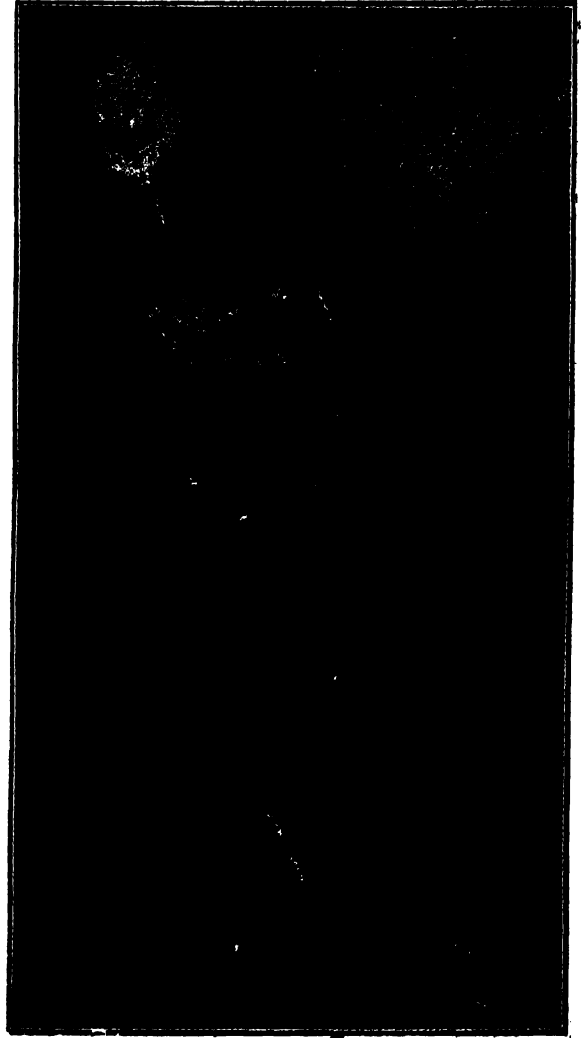
সন্ধ্যা

এই বুড়াকে কি তোমরা চেন? আমি ত এমন প্রাণ খোলা হাসি হাসিতে পারে এমন বুড়া অনেক দেখিয়াছি। পাড়া গাঁয়ের বুড়ারাই আবার বেশী প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারে!

কালিয় দমন

"কালিয় দমন"-এর কথা তোমরা নিশ্চয়ই পড়িয়াছ এবং গল্পটাও জান! এই ছবি খানি শ্রীযুক্ত আর্য্য কুমার চৌধুরীর আঁকা। ফোটো-চিত্রে আর্য্য কুমারের খুব সুন্দর হাত ও নাম!

বৃদ্ধের হাসি

পুরুষ ও মেয়ে এক সঙ্গে ক্ষেতে খামারে কাজ করে ইহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ! শ্রীযুক্ত অতুল বসু ঐ ছবিখানিতে তাহাই দেখাইয়াছেন। পুরুষ মাটী কাটিয়া মাটীর ঝুড়িটা স্ত্রীর মাথায় চাপাইয়া দিতেছে। পার্শ্বে কোদালখানা পড়িয়া রহিয়াছে তাহাও বোধ হয় তোমরা দেখিতে পাইতেছ!

দিন মজুর

এই ছেলে দুটি সাহেবের বটে কিন্তু বেশ, না ? ছেলে সবাইকারই সমান। কেমন হাসি হাসি দুষ্টামীভরা মুখ, এলোমেলো চুল, ছেলেমানুষী জামা, না ? ছবিদুখানি যিনি আঁকিয়াছেন তাঁর নাম রবার্টসন।
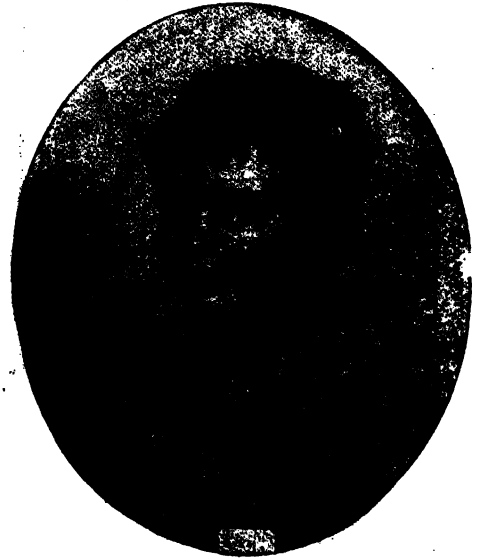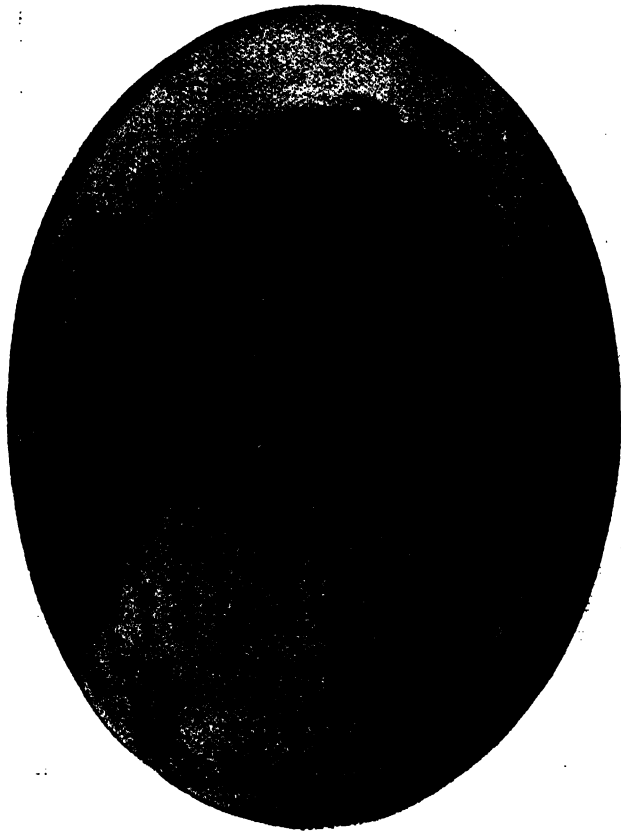
নিম্নেরটি একটি খোদিত মূর্ত্তি! ইংরাজীতে নাম—A Soul of the Soil বাঙ্গালায় আমরা চাষাই বুঝি! যে মাটি কাটিয়া, দেহপাত করিয়া শস্য উৎপাদন করে, সে!

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মলিক ভাস্কর।

মাটীর আত্মা

'ডোরিয়ান গ্রে' গল্পটি কি তোমরা পড়িয়াছ ? যদি না পড়িয়া থাক, পরে পড়িবে। আমরাই সে গল্পটি তোমাদের উপহার দিব। তখন এই ছবিটি মিলাইয়া পড়িও। আচ্ছা দেখ ত ভাই, ঐ যে যুবাপুরুষটি বসিয়া আছে, তাহার মুখের ভাবে কি রকম একাগ্রতা, তন্ময়তা, দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ডোরিয়ান গ্রে—শিল্পীর নাম জানা নাই

এই দেখ, বেচারা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াই দেখিল, তাহার অত সাধের পুতুলটির কি দশা হইয়াছে! আর সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিল না। গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল, মুখখানি কাঁদ কাঁদ হইল, বুকটি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল, যেমন তোমার একদিন না একদিন হইয়াছিল।

ভাঙ্গা পুতুল

চাষা

এ কে বল ত? চাষা! শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের আঁকা। অস্থিচর্ম্ম প্লীহাসার বাঙ্গালার চাষা হুঁকা কলিকা লইয়া মাঠের দিকে চলিয়াছে। যদি সহরের ছেলেরা কখনও পল্লীগ্রামে গিয়া থাক, বুঝিতে পারিতেছ ; পল্লীর ছেলেরা নিশ্চয়ই যামিনী দা'র দেখিবার ও আঁকিবার শক্তির প্রশংসাই করিতেছ!

এই দুষ্টু ছেলের মা খুব বকিয়াছেন, পড়ে না, কেবল খেলিয়া বেড়ায়, পাখীর বাসা পাড়ে, মা খুব বকিয়াছেন, ছেলেটি এ ঘরে ঢুকিয়া দেয়ালে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে আর তাহার পোষা কুকুরটি অমনি তার পাশে আসিয়া আদর জানাইতেছে, সহানুভূতি জানাইতেছে। যদি কথা কহিবার শক্তি কুকুরের থাকিত, সে নিশ্চয় এই কথাই বলিত —ছিঃ দাদা, কাঁদে না—চল, চল!

হাবলা ছেলেটি কি দেখিতেছে বল ত ? রূপ কথা, উপকথা পড়িয়া-শুনিয়া হাবুল চন্দ্রের এই ধারণা হইয়াছে যে পরীর দেশটা ঐ জানালা দিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে! হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে: দেখ না! বোকা হাবলা!

রূপকথার দেশ

এই দেখ কাণ্ড! মেয়েটি ছবি আঁকিতে শিখিতেছে! কি-জানি হয়ত একদিন সত্যই তাহার হাতের আঁকা ছবি দেখিয়া তুমি আমি সবাই মুগ্ধ হইব। কে বলিতে পারে বল?

ছবি আঁকা শিক্ষা

একটি মেমের মেয়ের ছবি দেখ! মেয়েটি তোমাদেরই কার-কার' বয়সী হইবে! এখনও বিবাহ হয় নাই। কেমন সোণালী ঝাঁকড়া চুলগুলি কাণের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, ভাসা ভাসা সুন্দর চোখ দু'টি টল টস করিতেছে, লম্বা গলাটি সুন্দর মেয়েটির সৌন্দর্য্য বাড়াইতেছে। শিল্পীর নাম ম্যাক্সওয়েল।

বালিকা-মূর্ত্তি

এই যে তুলিকা হাতে এক সুপুরুষ মূর্ত্তি দেখিতেছ, তোমরা শুনিয়া হয়ত আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে যে যাঁহার চেহারা এ, তিনি স্বয়ং এই ছবিখানি আঁকিয়াছেন। এই চিত্রশিল্পী, দেশযোড়া যাঁহার নাম ও খ্যাতি, ইনি এখানকার অনেক বড় বড় শিল্পীর গুরু তুল্য। নামটি বোধ হয় তোমাদের অপরিচিত নয়—শ্রীযুক্ত যামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়! ইনি গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ! এঁর হাতের স্বভাব-দৃশ্য এত সুন্দর যে একবার দেখিলে কখনই ভুলা যায় না। তোমরা যদি প্রদর্শনী দেখিতে, বুঝিতে! সেগুলির সৌন্দর্য্য রঙে, ফোটোতে যদি রঙ তোলা যাইত, সেগুলি আমি তোমাদের জন্য তুলিয়া আনিতাম। কিন্তু ফোটোয় একটি রঙই উঠে, আর উঠে না।
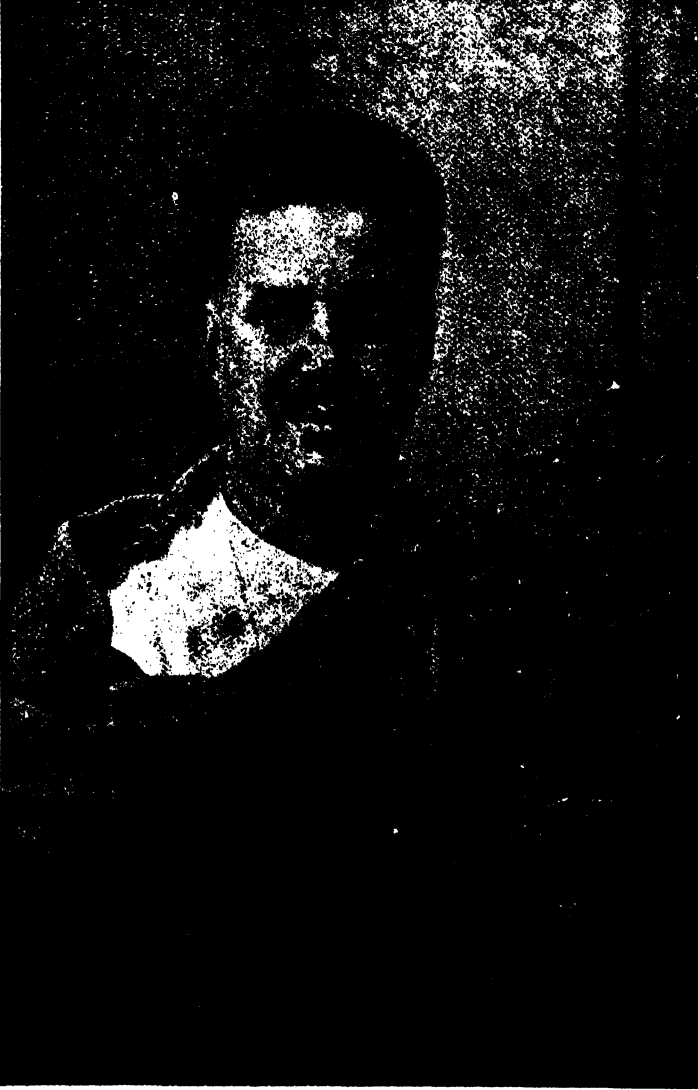
যাক্, পরে যখন প্রদর্শনী দেখিবে, তখন যামিনী বাবুর ছবিও দেখিবে আরও বড় বড় শিল্পীদেরও ছবি দেখিতে পাইবে।

শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে সকল ফোটো বাহির হইল, তাহা বন্ধুবর শ্রীযুত কে-ডি পাল তুলিয়া দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।—লেখক।

ঠাকুর নামদেব

(১)

কৈশোর-কথা

(রায় বাহাদুর শ্রীজলধর সেন)

অনেক দিন আগের কথা। কতদিন তা বল্‌তে পারব না—পুঁথিপত্রে সে কথা লেখা নেই। এক গ্রামে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর নাম বামদেব। যে সময়ের কথা বল্‌ছি, তখন বামদেব ঠাকুরের অবস্থা মন্দ ছিল না, সাধারণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের যেমন অবস্থা হয়, তেমনই অবস্থা। কিছু জোতজমা ছিল, তাই দিয়ে বামদেব ঠাকুর সংসার চালাতেন।

বাড়ীতে লোক জনও বেশী ছিল না,—বামদেব ঠাকুর বিপত্নীক ছিলেন। বাড়ীতে থাক্‌বার মধ্যে ছিলেন এক বিধবা কন্যা, আর সেই কন্যার একটী পুত্র; আর ছিলেন গৃহদেবতা মাধব। বামদেব ঠাকুর তাঁর এই দৌহিত্রের নাম রেখেছিলেন নামদেব। এই নামদেবের অপূর্ব্ব জীবন কথাই আজ তোমাদের শুনাতে এসেছি; সে কথা ব'লে আমি পবিত্র হব, শুনে তোমরাও পবিত্র হবে।

নামদেব ঐ এক রকমের ছেলে ছিল। তার যখন বয়স আট নয় বৎসর, তখনই তার মাতামহ ও মাতা দেখ্‌তেন যে, এ ছেলে আর দশজন ছেলের মত নয়। ও বয়সে আর সব ছেলে নানা রকম খেলা ধূলায় মত্ত হয়; নামদেব সে দিকেও যেত না। শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ রচয়িতা শ্রীলালদাস বাবাজী (কল্পিত নাম কৃষ্ণদাস) নামদেবের সে সময়ের ভাব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

"অন্যান্য বালক অন্য বাল্য চেষ্টা করে।
নামদেব কৃষ্ণসেবা ক্রীড়ায় বিহরে॥
মাতামহ স্থানে পুনঃপুন কান্দি কহে।
মুঞি কৃষ্ণ সেবিব নিযুক্ত কর মোহে॥
বামদেব কহে তুমি শিশুমতি হও।
বড় হৈলে করিহ এখন যোগ্য নও॥

মাতামহ ও মাতা বলেন "নামদেব, তুমি ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতে যাও।" নামদেব সে কথা শুনেও শোনে না; খেলা করিতে গেলে কৃষ্ণলীলা খেলা করে। মাতামহ যখন মাধবের পূজা করতে বসেন, বালক তখন তন্ময় হয়ে সেই পূজা দেখে।

বামদেব ঠাকুর দৌহিত্রের এই ভাবগতিক দেখে, তাকে তার বাসনার মতই শিক্ষা দিতে লাগলেন, বালক নামদেব পরম আগ্রহে সেই পরম শিক্ষা গ্রহণ করতে লাগ্‌ল। বালকের শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও মাধবের প্রতি অচলা ভক্তি দেখে বামদেব মনে বড়ই শান্তি বোধ করতেন।

এই সময় একদিন বামদেব ঠাকুরকে কোন কাজের জন্য দুই তিন দিন স্থানান্তরে যাওয়ার প্রয়োজন হল। তিনি তখন বামদেবকে ডেকে বল্‌লেন "ভাই, আমাকে দুই তিন দিনের জন্য স্থানান্তরে যেতে হবে। তুমি আমার অনুপস্থিতিকালে মাধবের পূজা করতে পারবে ?"

নামদেব আনন্দে অধীর হয়ে বল্‌ল "দাদামশাই, আমি পূজা করতে বেশ পারব। আপনি যেমন করে পূজা করেন, আমি ঠিক তেমনই করে পূজা করব ; মন্ত্রও ত আমি জানি।"

বামদেব বল্‌লেন "দেখ দাদা, আমার মাধব ত আর কিছু সেবা করেন না, আমি তাঁর সেবার জন্য নিজ হস্তে জ্বাল দিয়ে দুগ্ধ দিই। তুমি তা পারবে ত ? যদি অসুবিধা হয়, তোমার মাকে ব'লো, তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন।"

নামদেব বল্‌ল "সে আপনি ভাববেন না দাদা মশাই ! আমি নিজ হাতে দুগ্ধ জ্বাল দিয়ে মাধবকে বেশ করে খাইয়ে দেব।

বামদেব বালকের উপর মাধবের সেবার ভার দিয়ে গ্রামান্তরে চ'লে গেলেন।

যথা সময়ে মাধবের পূজা শেষ করে বালক নামদেব নিজ হস্তে দুধ জ্বাল দিতে গেল। মাতা সে কার্য্যের ভার নিতে চাইলেন, নামদেব কিছুতেই সম্মত হলো না ; বল্‌ল "না, না, সে হবে না মা ! দাদামশাই নিজে দুধ জ্বাল দিয়ে মাধবকে দেন ; আমিও তাই করব।"

মাতা আর আপত্তি করলেন না। দুধ জ্বাল আর শেষ হয় না। মা বললেন "বাবা, আর বেশী জ্বাল দিতে হবে না, এখন নামিয়ে ফেল।"

নামদেব বল্‌ল "আর একটু ঘন হোক মা ! ঘন না হ'লে মাধবের খেতে ভাল লাগবে না। ঘন দুধের সঙ্গে মিছরির গুঁড়া মিশিয়ে তবে ত মাধবকে খেতে দেব।"

মাতা আর কিছু না ব'লে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে পুত্রের কাণ্ড দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। অনেকক্ষণ জ্বাল দেবার পর দুধ যখন বেশ ঘন হ'য়ে এল, তখন তাতে মিছরির গুঁড়া দিয়ে নামিয়ে একটি পাত্রে ক'রে নামদেব সেই দুধ নিয়ে ঠাকুর ঘরে গেল ; পাত্রটি মাধবের সম্মুখে রেখে বল্‌ল "মাধব, তোমার খাবার জন্যে দুধ এনেছি, তুমি খাও।"

মাধব কথাও বলে না, দুধও খায় না। নামদেব বারবার বল্‌তে লাগ্‌ল, "মাধব, দুধ খাও।"

মাধব যখন কিছুতেই খাইল না, তখন নামদেব অত্যন্ত কাতর হ'য়ে বল্‌ল "মাধব, তুমি বুঝি আমার ওপর রাগ করেছ, আমি হয়ত তোমার পূজা ঠিক করিতে পারি না ; দাদামহাশয় যেমন ক'রে তোমার পূজা করেন, আমি তা কেমন ক'রে পারব ? আমি ছেলে মানুষ, এর আগে ত কখন তোমার পূজা করি নি, পূজা কর্‌তেও জানি নি, তাই বলে তুমি রাগ করবে কেন ঠাকুর ? দাদামহাশয় এখানে নেই, তিনি দুই তিন দিন আস্‌বেন না, আমাকে বারবার ক'রে ব'লে গিয়েছেন, তোমার পূজা করতে—তোমাকে দুধ খাওয়াতে ; তুমি না খেলে উপবাস ক'রে থাক্‌লে দাদামহাশয় বাড়ী এসে আমার উপর রাগ করবেন, আর তোমাকে উপবাসী রেখে আমরাই বা খাব কি করে, আমাদেরও যে তা হ'লে উপবাসী

থাক্‌তে হবে ! আমরা না হয় উপবাস ক'রেই থাক্‌লাম, কিন্তু তুমি ঠাকুর – দেবতা, তুমি বাড়ীতে উপবাস করে থাক্‌বে, সেত কিছুতেই হ'তে পারে না। আমার কথা শোন মাধব, তোমাকে দুধ খে'তে হবে। আমি যে দাদামহাশয়কে বলেছি, আমি তোমার পূজা করতে পারব, তোমাকে দুধ খাওয়াতে পারব, আমার সে কথা যে মিথ্যে হ'য়ে যাবে মাধব। আমি ছেলে মানুষ, যদি ঠিক ঠিক তোমার পূজা করা, না পেরেই থাক, তুমি সে অপরাধ নিও না ;—তুমি দুধ খাও মাধব, দুধ খাও ; আমি তোমার কাছে হাত যোড় করছি, আমার অপরাধ ক্ষমা কর।"

বালকের এই কাতর আবেদন, এই করুণ প্রার্থনা মাধবের হৃদয় যে স্পর্শ করল, তা মোটেই বুঝ্‌তে পারা গেল না ; মাধব সিংহাসনের উপর যেমন ভাবে বসে ছিল, তেমনই ব'সে রইল।

নামদেবের তখন আর একটি কথা মনে হ'ল। সে বলে উঠ্‌ল, "মাধব, আমারই ভুল হ'য়েছে। দাদামহাশয়ের দেখেছি, তোমার খাবার জন্যে, তোমার সম্মুখে দুধ রেখে ঘরের দুয়োর বন্ধ করে বাইরে আস্‌তেন। তুমি বুঝি কারুর সম্মুখে খাও না মাধব ? তা বেশ, আমি বাইরে গিয়ে দুয়োর বন্ধ ক'রে দিচ্ছি, তুমি দুধ খাও।"

এই বলে নামদেব ঠাকুর ঘরের দুয়ার বন্ধ ক'রে দিয়ে বাইরে এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তার মনে হ'ল, হয়ত মাধব এতক্ষণে দধ খেয়েছে। সে তখন দুয়ার খুলে দেখে, যেমন দুধ তেমনই প'ড়ে আছে, মাধব দুধের পাত্র স্পর্শও করে নি।

বালক নামদেবের তখন আর এক কথা মনে হ'ল। তার মনে হ'ল, যে দুধ সে মাধবের খাবার জন্যে নিজে হাতে জ্বাল দিয়ে দিয়েছে, তা হয়ত কোন রকমে অপবিত্র হ'য়েছে ; তাই মাধব সে দুধ স্পর্শ করল না। বালক তখন তাড়াতাড়ি সে দুধ ফেলে দিয়ে আবার নূতন ক'রে অতি সন্তর্পণে দুধ জ্বাল দিয়ে নিয়ে মাধবের সম্মুখে রেখে বল্‌ল, "মাধব, এ দুধ কিছুতেই অপবিত্র হয়নি, এখন তুমি খাও।"

মাধব কিন্তু তেমনই অটল-অচল। বালক অধীর হ'য়ে উঠ্‌ল। ঠাকুর ঘরের এক পাশে একখানি বঁটী ছিল, সেইখানি নিয়ে এসে মাধবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বল্‌ল, "মাধব, তুমি উপবাসী থাক্‌বে, সে কিছুতেই হবে না ; নিশ্চয়ই আমার কোন অপরাধ হ'য়েছে, আমি তার শাস্তি নিচ্ছি।"

এই ব'লে বালক নামদেব নিজের গলায় বঁটী আঘাত করতে যেমন উদ্যত হবে, অমনই এত ক্ষণের নীরব নিশ্চল দেবতা মাধব সিংহাসন থেকে নেমে এসে ডান হাত দিয়ে বঁটী ধরলেন, আর বাঁ হাতে সেই দুধের পাত্র তুলে নিয়ে খানিকটা দুধ পান করলেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু মাধব বালক নামদেবের অচলা ভক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন। বালক কৃতার্থ হ'য়ে মাধবকে প্রণাম করল ; মাধব পূর্ব্বের মত সিংহাসনে গিয়ে বস্‌লেন। বালক নামদেব মাধবের ভুক্তাবশিষ্ট দুগ্ধপ্রসাদ নিজে না খেয়ে তার দাদামহাশয়ের জন্যে রেখে দিল। দাদামহাশয় ত তাকে প্রসাদ পেতে ব'লে যান নি।

তৃতীয় দিনে বামদেব ঠাকুর বাড়ীতে ফিরে এসে প্রথমেই তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাই, এ কদিন মাধবের যথারীতি পূজা সেবা হ'য়েছিল ত ?"

নামদেব হৃষ্টচিত্তে বল্‌ল, "হাঁ দাদামহাশয়, আমি ঠিক ঠিক পূজা করেছি; মাধবকে এ কয়দিন নিজ হাতে দুধ খাইয়েছি, আপনার জন্যে প্রসাদ রেখেছি।"

ইহার পরের কথা আমি নিজে না ব'লে শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে যা বলেছেন, তাই উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি। ভক্তবৎসল ভগবানের কথা পরমভক্ত কৃষ্ণদাস বাবাজীর মুখে শুন্‌তে যেমন ভাল শোনাবে, আমি কি আর তেমন ক'রে বল্‌তে পারব!

শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী বলেছেন,—

নামদেব কহে ঠাকুরেরে খাওয়াইয়া।
প্রসাদ রাখ্যাছি ধর্‌্যা তোমার লাগিয়া॥
পাত্রেতে কিঞ্চিত দুগ্ধ দেখি বামদেব।
তুমি দুগ্ধ খাইলে কহে করিয়া আক্ষেপ॥
বালক কহয়ে দাদা তোমার শপথ।
ঠাকুর খাইলা মোরে দেহ অপবাদ॥
চমকিত হইয়া যে কহয়ে বালকে।
কেমতে ঠাকুর খাইলা দেখাহ আমাকে॥
বিগ্রহ কি হস্তে তুলি লোকে দেখাইয়ে।
ভোজন করয়ে কোথা কভু না দেখিয়ে॥
শিশু কহে কেন হেন কহ অনোচিত।
আমার সাক্ষাতে তুলি খায় নিতি-নিত॥
প্রথমে কি মনে ভাবি না খাইলা হরি।
মরিব কহিনু মুঞি লইয়া কাটারি॥
তবে মোর হাত ধরি হাসিতে হাসিতে।
দুগ্ধ পান কৈল মোর আনন্দিত চিতে॥
বামদেব কহে মোরে দেখাইতে পার।
শিশু বলে দেখাইব কি সন্দেহ কর॥
পরদিন শিশু দুগ্ধ ঠাকুরের আগে।
রাখিয়া খাইতে কহে বামদেব-লগে॥
দাদা কহে তুঞি খাইলি ঠাকুর না খায়।
দেখুক সাক্ষাতে তবে সন্দেহ ঘুচয়॥
না খাইলা যদি পুন মরিবারে চাহে।
কান্দয়ে বালক দুনয়ানে ধারা বহে॥

আস্তে ব্যস্তে ঠাকুর দুগ্ধের পাত্র লৈয়া।
খাইতে লাগিলা পুন হাসিয়া হাসিয়া॥
দরশনে নামদেব যে অপেক্ষা ছিল।
নামদেব-সুসঙ্গে তাহাও পূর্ণ হৈল॥
দেখি চমৎকার বালকের পদ ধরি।
নতি স্তুতি কৈলা বহু আপনা ধিক্কারি॥

ঠাকুর নামদেবের কিশোর বয়সের কথা তোমাদের কাছে বল্লাম। তাঁর পরবর্ত্তী জীবনের কথা আরও সুন্দর, আরও পবিত্র। ভগবানের উপর অচলা ভক্তি থাক্‌লে মানুষ কেমন করে দেবোপম হয়, কেমন করে দশজনকে সাধু করে তোলে, ঠাকুর নামদেবের জীবনে তার জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে। বারান্তরে এই মহাপুরুষের অপূর্ব্ব কাহিনী তোমাদের কাছে বল্‌ব। (ক্রমশঃ)
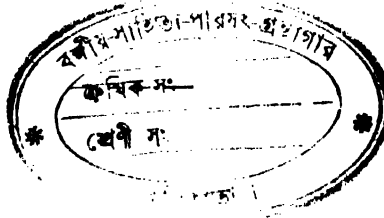
পুস্তক পরিচয়

শিল্প-কলা চিত্রে ও গল্পে। চিত্রে ও গল্পে শিরিসের একখানি বই। মূল্য ১৷৷০ টাকা। সেই বই খানিতে বিশ্বশিল্পীদের অঙ্কিত বহু একবর্ণের ও বহুবর্ণের চিত্র, তাহাদের পরিচয় ও চিত্রকরের জীবনের গল্প আছে। ইহারই কতকগুলি যখন "আমার দেশে" বাহির হয় তখন পাঠক পাঠিকা মহলে খুব একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। একমাস যদি না বাহির হইয়াছে, অমনি অভিযোগ আসিত। বালক বালিকাদের এই আগ্রহ দেখিয়াই বহিখানি সুন্দর করিয়া ছাপিয়া বাহির করা হইয়াছে! একবার নয়, দশবার করিয়া ছেলে মেয়েরা এই বহি পড়িবে ও ইহার ছবি দেখিবে।

স্বাস্থ্য চিত্রে ও গল্পে। আমাদের প্রকাশিত "বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে" বইখানি যখন বাঙ্গালাদেশের বালক-বালিকা মহলে আনন্দ ও উৎসাহের কল্লোল তুলিয়াছিল, তখন হইতেই আমাদের ইচ্ছা ছিল স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষনীয় কঠিন বস্তুগুলি বিজ্ঞানের মত সহজ সরল ও সুখপাঠ্য গল্পের ভিতর দিয়া বাঙ্গালার ছেলে-মেয়েদের উপহার দিব। কাজটা সহজ নয় বলিয়া কেহই এতদিন করিতে চেষ্টা পান নাই, কিন্তু শক্ত জিনিষকে সহজ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা আমরা প্রথম হইতেই করিয়া আসিতেছি— আমাদের বিজ্ঞান যে এত আদর পাইয়াছে, প্রতি বৎসরে তাহার হাজার হাজার বই কাটিতেছে, ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। আমাদের স্বাস্থ্যের গল্পগুলি ছেলেরা যে আগ্রহভরে পড়িবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই, অধিকন্তু গল্পের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের মূলনীতি শিখিতে পারিয়া দেহ মন সুস্থ রাখিতে পারিবে। মূল্য ১৲।

প্রাচীন জগৎ, আদিম জগৎ ও বর্ত্তমান জগৎ—চিত্রে ও গল্পে। আর তিনখানি ঐ সিরিজের বই। প্রাচীন জগত, আদিম জগত ও বর্ত্তমান জগৎ সম্বন্ধে গল্প আর ছবি। নীরস ইতিহাস নয়, ইতিহাসের সরল গল্প। ছেলেরা এই তিনখানি বই পাঠ করিলে ইতিহাসও তাহাদের অজ্ঞাতে পাঠ করা হইয়া যাইবে এবং গল্পগুলা বহুকাল মনে করিয়া ইতিহাস পাঠের চির সহায়তা করিবে। প্রত্যেক খানির মূল্য ১৲।

নূতন ধাঁধা।

১। আকাশের আগে আছে প্রথম অক্ষর
দ্বিতীয় মেঘের শিরে থাকে নিরন্তর।
তৃতীয় পাইবে খুঁজি পরিধির মাঝে,
চতুর্থ তারকা শেষে সদাই বিরাজে।
চারিবর্ণ যোগে আমি বিখ্যাত ভুবন,
সুদূর সমুদ্র বক্ষে অতি মনোরম,
অবশেষে শুন আমি খুব বড় দেশ,
কি নাম আমার ভাই করহ নির্দ্দেশ।

২। দুই বর্ণে নাম মোর অতি পুণ্য নাম
সেকালের জনপ্রিয় নৃপতি প্রধান
উল্টাইলে হয়ে যাই অপবিত্র দেহ
ঘৃণা করি মোরে কিন্তু পরশেনা কেহ।
কেবা আমি নরপতি বল শিশুগণ
আমার নামেতে পাপ করে পলায়ন।

৩। দুই বর্ণে নাম মোর সুমধুর যশ,
বৎসরে একবার মাত্র জনমি কেবল,
শরৎ কালেতে আমি আসি ঘরে ঘরে
আর কোন কালে কিন্তু পাবে না আমারে
উল্টাইয়া দেখ মোরে পাইবে জঙ্গলে,
অথবা ফুলের বনে বিটপীর কোলে।
আর মোর নাহি দিব কোন পরিচয়
এখন আমার নাম করহ নির্ণয়।

৪। দুই বর্ণে নাম মোর অরণ্য ভীষণ
উল্টাইয়া দেখ মোরে হইব নূতন।

(শ্রীনিবারণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

৫। দু অক্ষরে নাম মোর থাকি আকাশ পথে
অন্যরূপে থাকি আমি জীব জন্তুর সাথে।
নিজেরে ভিতরে তুমি দেখিবেনা মোরে
অন্যের ভিতরে দেখ একটু চেষ্টা করে॥

(শ্রীব্রজেন্দ্র নারায়ণ নন্দী।)

— ——

গত বর্ষের অগ্রহায়ণে যে চিত্র-ধাঁধা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার উত্তর কেবলমাত্র শ্রীমতী অমিয়া দেবী পাঠাইয়াছেন। তিনি চিত্রটিকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ও জুড়িয়া বিখ্যাত বায়স্কোপ-অভিনেতা হাস্যরসিক চার্লি চ্যাপলিনের মূর্ত্তি পাঠাইয়াছেন। আমরা শ্রীমতী অমিয়া দেবীর প্রেরিত রস-রাজ চার্লির সেই অদ্ভুত মূর্ত্তিটি পরে ছাপাইব।
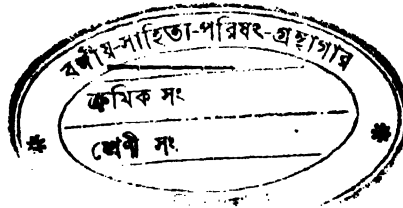
শ্রীশিশির কুমার বসু কর্ত্তৃক শিশির প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৫৯ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছেলে মেয়েদের আর একখানি যুগান্তকারী বই

স্বাস্থ্য চিত্রে ও গল্পে

সম্পূর্ণ নুতন ধরণের বই—

শুধু চিত্র ও গল্পের মধ্য দিয়া, স্বাস্থ্যের মূল নিয়মগুলি বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এ ধরণের বই অদ্যাবধি কোন দেশে প্রকাশিত হয় নাই। বইখানি চিত্রে চিত্রময়—অনেকগুলি একরঙা, দু'রঙা ও তিনরঙা ছবি আছে। যাহারা আমাদের প্রথম উদ্যম **বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে'** পড়িয়াছেন তাঁহাদের এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বইখানি পড়িতেই হইবে। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস এই বইখানি শিশু-সাহিত্যে যুগান্তর আনিবে।

চিত্রে ও গল্পে

চিত্রে ও গল্পে সিরিজের আর একখানি বই। এই বইতে বিবিধ শিল্পীদের কথা গল্পচ্ছলে বলা হইয়াছে ও তাহাদের আঁকা ছবি ও তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই বইখানি পড়িলেই র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলা, টিসিয়ান, লিওনার্ডো ডি, ভিন্সি প্রভৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সহিত ছেলেমেয়েদের পরিচয় হইবে। আগাগোড়া আর্ট পেপারে ছাপা, রঙিন কালী, সুন্দর বাঁধাই। মূল্য ১৷৹ মাত্র।

—

দেশ বিদেশ

চিত্রে ও গল্পে

উদার ও সার্ব্ব-জনীন শিক্ষা পাইতে হইলে দেশ বিদেশের সহিত ছেলেমেয়েদের পরিচয় হওয়া আবশ্যক;—শুধু গল্পের মধ্য হইতে এত সুন্দর ও সহজ ভাবে এই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে যে শুধু এই বইখানি পড়িলে ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন জাতি ও দেশ সম্বন্ধে বেশ স্পষ্ট একটা ধারণা জন্মিবে।

নানা দেশের ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তত্ত্ব, নানা জাতির ইতিহাস, তাঁহাদের "আচার ব্যবহার, রীতি, নীতি পদ্ধতি; প্রত্যেক জাতির বিশেষত্ব এই সব অতি সুন্দর সরলভাবে চিত্র ও গল্পের মধ্য দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে মূল্য ১৲।

—

নুতন প্রকাশিত হইয়াছে—

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি, এ প্রণীত

গল্প সল্প

বিলাতী গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত কয়েকটি গল্প। গল্পগুলির ভাব ও ভাষা অতি উচ্চদরের। এই বইখানির আর একটি বিশেষত্ব নীতি-উপদেশ এই গল্পগুলির মধ্যে অতি প্রচ্ছন্নভাবে উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে,—তাহাতে বইর আকর্ষণী-শক্তি ত কমে নাই-ই বরং অনেক বাড়িয়াছে। সুন্দর ইমিটেসন মরোক্কো বাঁধাই। মূল্য ৷৷৹ আনা।

—

রোমের গল্প

রোমের চির নূতন ঐতিহাসিক গল্পগুলি অতি সহজ ভাষায় বালকবালিকাদের জন্য লিখিত।

মূল্য ৷৵৹ আনা।

Reg. No. C-1094.

শ্রীশিশিরকুমার বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিশির প্রেস,—৫২নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক বার্ষিক

সম্পাদক—

প্রতি সংখ্যা

ফাল্গুন মাসের সূচীপত্র।

নমাজ

৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা। ফাল্গুন, ১৩৩০।

উদ্যমশীলতা।

কি কারণ, ভীরু তব মলিন বদন ?
যতন করহ, লাভ হইবে রতন।

কেন পান্থ, ক্ষান্ত হও
হেরি দীর্ঘ পথ ?
উদ্যম বিহনে কার
পুরে মনোরথ ?

কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন
কমল তুলিতে ?
দুঃখ বিনা সুখ লাভ
হয় কি মহীতে ?

বিজ্ঞানের চুট্‌কী

জ্বর ছাড়াইও না!

(শ্রীকালিপ্রসাদ ঘোষ, বি এস্‌ সি।)

সারা জীবনে অন্ততঃ একবারও জ্বরে না পড়িয়াছে, এমন লোক আমি তো একটীও দেখি নাই;—বিশেষতঃ আমাদের এই বাংলাদেশে। সব রকমের জ্বরের তো এদেশটী একটি ডিপো বলিলেই হয়। সাদা জ্বর, কালা জ্বর, হল্‌দে জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, টাইফয়েড জ্বর, ঘুস্‌ঘুসে জ্বর,—কোন্‌টা এদেশে নাই তাই বল। জ্বরের কল্যাণে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য গিয়াছে, সুখ গিয়াছে, দেহের শক্তি গিয়াছে, মনের তেজ গিয়াছে, চোখের দৃষ্টি গিয়াছে,—যায় নাই কি? রূপকথার রাক্ষসী যেমন রাজ্যশুদ্ধ সব খাইয়া শেষে রূপার কাঠীর স্পর্শে রাজকন্যাটীকে পর্য্যন্ত অচেতন করিয়া রাখিয়াছিল; এই জ্বর রাক্ষসীর দলও তেমনি কোন্ কুক্ষণে বাঙ্গালাতে ঢুকিয়া বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য, সুখ, তেজ, উদ্যম সকলি খাইয়া, না জানি কোন্ রূপার কাঠীর স্পর্শে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনটীকে একেবারে নিঃসাড় করিয়া রাখিয়াছে! এ রাক্ষসী আমাদের হাড় খাইয়াছে, মাস খাইয়াছে, এখন আমাদের চামড়াটুকু লইয়া ডুগ্‌ডুগি বাজাইবার বন্দোবস্ত করিতেছে।

জ্বর কেউ চায় না।—তুমিও না, আমিও না,—ভদু খানসামাও না! জ্বর না হইলে আমরা খুসী হই; আর জ্বর হইলে আমরা তাড়াতাড়ি জ্বর ছাড়াইবার জন্য ব্যস্ত হই। এ মতি গতি আমারও, তোমারও, ভদু খানসামারও। তাই ডাক্তাররা, বদ্যিরা, হকিমেরা, হাতুড়েরা সবাই এতকাল ধরিয়া জ্বর ছাড়াইবার ওষুধ খুঁজিয়া ফিরিতেছিলেন। এতগুলি লোকের এতকালের চেষ্টায় ওষুধ যে দুই একটা মেলে নাই, তাহা নহে। যেমনই কেন জ্বর হউক না, সে ওষুধের একদাগ খাওয়াইলেই জ্বরও তাহাতে ছাড়ে বটে; কিন্তু——

এই কিন্তুই যত সর্ব্বনাশের গোড়া। আজ কালকার বড় বড় ডাক্তাররা সব কি বলেন জান?—তাঁরা বলেন ঐ "কিন্তু"। তাঁদের মতে জ্বর ছাড়ান আমাদের উচিৎ নয়। কথাটা খুবই অদ্ভুত শুনাইতেছে, নয়? কিন্তু আমি কি করিব বল,—সত্যই আজকালকার বড় বড় ডাক্তারদের এই মত। তাঁরা নাকি সম্প্রতি পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন যে, মানুষের শরীরে যে জ্বর হয়, তাহার কারণ মানুষের শরীরে কোনও এক প্রকার বিষ (toxin) জমা হয়। এই বিষ নানাপ্রকার জীবাণুর মারফতে আসিতে পারে। যে উপায়েই হউক, জ্বরের বিষ একবার শরীরে ঢুকিলেই মানুষকে কাবু করিতে চেষ্টা করে। এই অবস্থায় মানুষের শরীর যদি খুব গরম থাকে (অর্থাৎ যদি তাহার জ্বর হয়) তাহা হইলে মানুষ এই জ্বরের বিষের সঙ্গে সহজে যুঝিতে পারে,—এবং অনেক ক্ষেত্রেই এই বিষকে নাশ করিতে পারে। কিন্তু জ্বর ছাড়াইয়া দিলে, মানুষের যুঝিবার শক্তি অনেক কমিয়া যায়; এবং অনেকস্থলেই তার মৃত্যু ঘনাইয়া আসে। ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে জ্বর তাই মানবশরীরে বিষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

তোমরা প্রমাণ চাও? তা, প্রমাণ আছে বই কি! যে সব ছোট ছোট জীবাণু নিউমোনিয়া রোগের বাহন, তাহারই কতকগুলি খরগোসের শরীরে ঢুকাইয়া দিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল। দেখা গেল, ইহাদের মধ্যে যে খরগোশগুলিকে খুব গরম জায়গায় রাখা হইয়াছিল সেগুলি অপরগুলির অপেক্ষা বেশিদিন বাঁচিল। আবার ডিপ্‌থিরিয়া রোগের দ্বারা আক্রান্ত কতকগুলি প্রাণী সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, যে তাহাদের মধ্যে যে কয়টীর কৃত্রিম উপায়ে জ্বর সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেই কয়টীই অপেক্ষাকৃত বেশীদিন বাঁচিয়াছে। অতএব, হে ভদ্র খান্‌সামা! এবার হইতে জ্বর ছাড়াইবার জন্য ব্যস্ত হইও না।

তোমরা হয়ত ভাবিতেছ যে জ্বর ছাড়ান যখন উচিৎ নয়, তখন জ্বর হইলে ডাক্তারেরা কিসের ওষুধ দেন? কিসের ওষুধ দেন জান? সাধারণতঃ তাঁহারা জ্বরের কষ্ট (যেমন মাথাব্যথা ইত্যাদি) কমাইবার জন্য ওষুধ দেন;—আর জ্বর খুব বেশী বাড়িলে, জ্বরটাকে একটুখানি কমাইবার ওষুধও দেন। জ্বর থাকা ভাল বটে, কিন্তু খুব বেশী জ্বরও আবার ভাল নয়। খুব বেশী জ্বর হইলে শরীরের সব কলকব্জা, বিশেষতঃ মস্তিষ্ক বেজায় বিগড়াইয়া যায়;—সেটা মোটেই ভাল নয়। তাই ডাক্তাররা খুব বেশীজ্বরের সময় জ্বর খানিকটা কমাইবার জন্য ওষুধ দেন, কিন্তু একেবারে জ্বর ছাড়ান না। বুঝিলে?
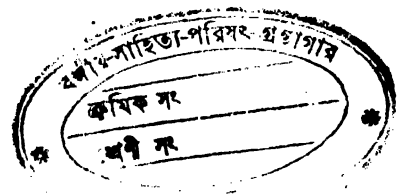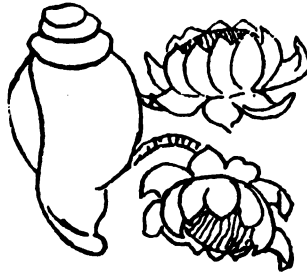
ওস্তাদ দাবা খেলোয়ার

(শ্রীঅপূর্ব্ব ঘোষ)

ফ্যাটি আর পিটারেতে
বড্ড মেলা মেশা,
দুজনারই ছিল বেজায়
দাবা খেলার নেশা।

স্নান খাওয়া ঘুম নাইকো তাদের
মত্ত খেলা নিয়ে,
পিটার করে ভুল—ফ্যাটি সে
দেখায় আঙুল দিয়ে।
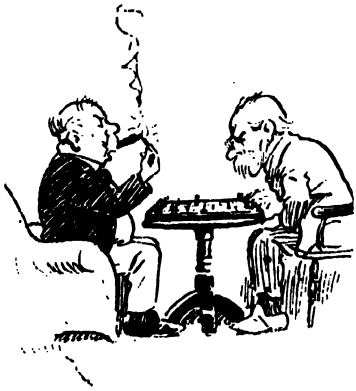
খেল্‌তে বসে ফ্যাটি সেদিন
চুরুট খানা জ্বেলে
দিয়াশলাইর কাঠি খানা
পাশেই দিল ফেলে।
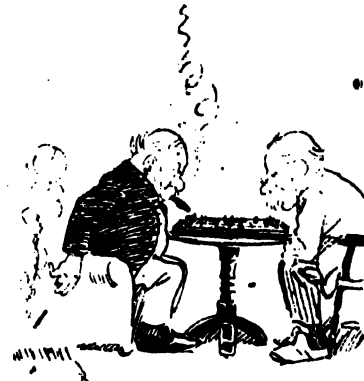
কাঠির আগুন যায় নি নিভে,
জ্বল্‌তেছিল ধীরে,
ক্রমে তাহা উঠ্‌ল জ্বলে
ফ্যাটির চেয়ার ঘিরে।

ফ্যাটির তবু নাইকো খেয়াল—
খেলার দিকেই মন,
পিটার ভাবে—আজ বুঝিব
খেলায় কে কেমন।

আগুন ক্রমেই উঠ্‌ল ছাতে,
ধোঁয়ায় গেল ভরে,
ফ্যাটি পিটার মাথা গুঁজে
খেলাই তবু করে!

আগুন! আগুন! হৈ রৈ হৈ!
কি কলরব উঠে,
খবর পেয়ে দমকল ঐ
আস্‌ছে বেজায় ছুটে।

ঘরে তখন ভীষণ আগুন,
খেলা কি ছাই থামে?
টেবিল খানা খুলে দুজন
সিঁড়ি বেয়ে নামে।

নাম্‌ছে আর চাল্‌ছে দেখ—
খেলার বিরাম নাই,
এম্‌নিতর খেলোয়াড়ের
বলিহারি যাই!

দালান কোঠা রইল কি না
পুড়েই হ'ল শেষ—
কে করে তার খবর? দেখ
খেল্‌ছে ওরা বেশ।

পথের মাঝেই হাঁটুগেড়ে
খেল্‌ছে দুজনায়,
সাবাস্‌! দাবা-খেলোয়াড় ভাই!
সাবাস্‌ দুনিয়ায়!
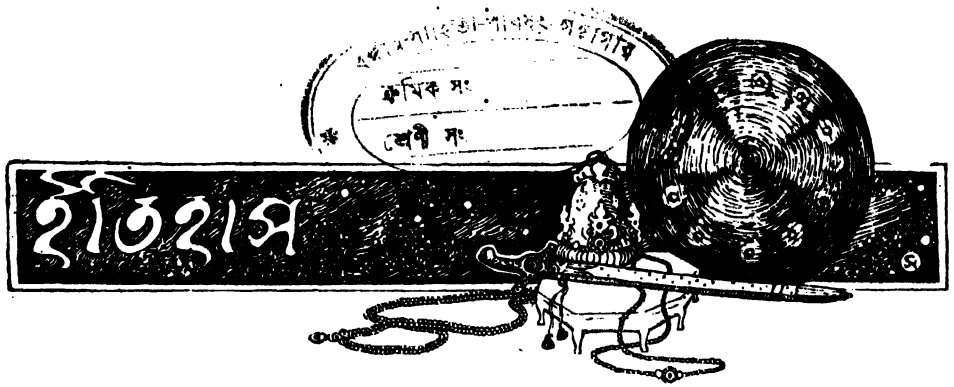
গারিবাল্‌ডি

(প্রোফেসর শ্রীঅরুণচন্দ্র সেন এম্, এ)

গত মহাযুদ্ধের সময়ে একদিন লণ্ডন সহরে একটি বৃদ্ধলোক পথে হাঁটিতেছিলেন, তাঁহার পোষাকটা একটু অদ্ভুত রকমের ছিল, তাঁহার মাথার টুপিটা নিতান্ত সেকেলে রকমের, বহুদিনের ব্যবহারে তার রঙ অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আমাদের দেশে এইরূপ লোক পথে চলিতে দেখিলে কেহই তাহাকে লক্ষ্য করে না, কিন্তু বিলেতে লোকে পোষাকের একটু এদিক ওদিক হইলেই অমনি তাহার পিছু নেয়। এই বৃদ্ধ লোকটির সিপাহী-ধরনের চলন ও তাঁহার অদ্ভুত টুপি দেখিয়া তাঁহার চারিধারে ভিড় জমিয়া গেল, কিন্তু তাঁহার তাহাতে গ্রাহ্যই ছিল না, মনে হইল যেন ভিড় জমিতে দেখিয়া তিনি একটু খুসী হইয়াছেন। লোকগুলি তাঁহাকে পাগল বলিয়া ভাবিয়া হাসি ঠাট্টা করিতে লাগিল। খানিকটা দূর চলিয়া বৃদ্ধ লোকটি রাস্তার জনতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন ;—

"আমি ইচ্ছা করেই এই টুপি পরে থাকি, কারণ তাতে আমাকে দেখবার জন্য লোক জড় হয়, আমি তাদিগকে এই একটি কথা বল্‌তে চাই যে, আমি গারিবাল্‌ডির "হাজারের" একজন ছিলাম, আমি এই টুপি পরে তাহার সঙ্গে স্বাধীনতার যুদ্ধ করি। তখন যেমন বীরত্বের দরকার ছিল আজকের দিনেও তাহা অপেক্ষা জীবন উৎসর্গ করার কম প্রয়োজন নাই।"

এই কথা শুনিয়া লোকগুলোর কোথায় গেল হাসিঠাট্টা চলিয়া ; তাহাদের মন ভক্তিতে ও শ্রদ্ধায় ভরিয়া গেল। কখন গিয়া তাহার হাত ছুঁইয়া তাহাকে সম্মান দেখাইতে পারিবে তাহার জন্য লোকে ভিড় ঠেলিতে লাগিল। গারিবাল্‌ডির নামে সমস্ত য়ুরোপ কেন এমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়, তাঁহার "হাজারে" নাম শুনিলে কেন সকলে বিস্মিত হইয়া উঠে তাহা তোমাদিগকে জানাইলে তোমরাও গারিবাল্‌ডির স্মৃতি তেমনি সযত্নে রক্ষা করিবে।

য়ুরোপের মানচিত্র দেখিলে তোমাদের মনে হয় যেন একটা বিরাট পশু ভূমধ্য সাগরের মধ্যে তিনটি ঠ্যাঙ্ ছড়াইয়া দিয়া আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের দিকে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই তিনটি পা'র মধ্যে মাঝের পা'টি সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা ; এমন কি মানচিত্র ভাল করিয়া দেখিলে তলায় গোড়ালি পর্য্যন্ত দেখা যাইবে। যে টিকে মানচিত্রে সর্ব্বাপেক্ষা বড় পা'র মতন দেখায়, সেইটি য়ুরোপের ইতালি উপদ্বীপ, ইহার তিনধারে সমুদ্র, উত্তরে য়ুরোপের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতমালা আল্‌প্‌স্ ইহাকে ঘেরিয়া আছে।

য়ুরোপের ইতিহাসে ইতালির স্থান খুব উচ্চে। এই দেশের রোম নগর এক সময়ে পৃথিবীতে এমন একটি সম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল যাহার তুলনা কখনও হয় নাই এবং ভবিষ্যতে কখনও হইবে কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। য়ুরোপ এখন বুক ফুলাইয়া যে সভ্যতার গৌরব করিয়া থাকে, তাহা তাহার ইতালির কাছ হইতে পাওয়া; আইন আদালত ধর্ম্ম সমস্তই য়ুরোপ রোমের নিকট হইতে পাইয়াছে। কিন্তু এহেন সম্রাজ্যেরও এক সময়ে পতন হইয়াছিল। যাহারা এই বিশাল জিনিষটা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়াছিল তাহারা য়ুরোপের রাইন এবং ডানিয়ুব নদীর ওপারে থাকিত, তাহাদের সভ্যতা কিছুই ছিল না, কেবলমাত্র সাহস এবং সংখ্যার বলে তাহারা রোমের সাম্রাজ্য ধ্বংশ করিয়াছিল। তখন হইতে ইতালির সাম্রাজ্য গেল, স্বাধীনতা গেল এবং যে সভ্যতার আলোক সে পৃথিবীতে ছড়াইয়া ফেলিয়াছিল তাহাও নিভিয়া গেল। য়ুরোপের বর্ত্তমান জাতিগুলির সকলেই এই বর্ব্বর জাতিগুলি হইতে উৎপন্ন হয়। যে রোমকে তাহারা ধ্বংশ করে তাহার সভ্যতার কাছে তাহারা মাথা হেঁট করে এবং তাহারই নিকট সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু ইতালির গৌরব তখন হইতে অস্তমিত হইল। কেবলমাত্র পুনরায় একবার ইতালির কতকগুলি নগর তাহাদের চারিধারে দেওয়াল গাঁথিয়া বাহিরের জমিদার এবং রাজার উৎপাত কাটাইয়া উঠিয়া স্বাধীন হইয়াছিল। এই সকল নগরের লোকেরা রাজা উজীর মানিত না তাহারা তাহাদের মধ্য হইতেই লোক বাছিয়া লইয়া তাঁহাদের হুকুম মানিয়া চলিত। স্বাধীনতার আবহাওয়া একটা বড় জিনিষ। যাহারা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করিতে পারে তাহারাই চিরকাল সকল বিষয়ে বড় হয়। ইতালির এই সকল নগরে সাহিত্যের, বিজ্ঞানের এবং শিল্পকলার যে উন্নতি হইয়াছিল তাহার তুলনা কোথায়ও হয় নাই। এই সকল নগর হইতেই য়ুরোপের নব জ্ঞানের প্রচার হয়। কিন্তু কাল ভাল মন্দ উভয়কেই গ্রাস করে। ইতালির নগরগুলিও অবশেষে কতকগুলি রাজার অধীন হইল। ইহার পরে বাহির হইতে শত্রু আসিয়া ইতালির সমস্ত সম্পদ লুটিয়া লইয়া গেল।

যখন ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন ইতালি জয় করিয়া ইতালির রাজা বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করেন, তখন ইতালিতে কতকগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা রাজ্য ছিল। এই সকল রাজ্যের রাজারা ছিল বিদেশী, তাহাদের সঙ্গে ইতালির জাতির কোন নাড়ীর টান ছিল না, তাহাদের অত্যাচারে ইতালীয়গণের দুঃখ কষ্টের সীমা ছিল না। নেপ্‌ল্‌সের রাজা বুঁর্বোঁ-বংশীয়। তাঁহার আত্মীয় ফরাসী রাজা ফরাসী জাতির হাতে অশেষ লাঞ্ছিত হইয়া অবশেষে গিলোটিনে মাথা হারাইলেন; রাজা যদি প্রজাকে আপনার না করিতে পারে তাহা হইলে তাঁহার কি ভীষণ পরিণাম হয় তাহা অনেকেই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু নেপ্‌ল্‌সের বুঁর্বোঁ রাজা এই সোজা সত্য কথাটি বোঝেন নাই। ইতালিতে তখন ভেনিসেই একমাত্র স্বাধীন লোকের বাস ছিল। উত্তরে লোম্বার্ডিতে অষ্ট্রীয়ার রাজা ছিলেন হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা; তাঁহার শাসনে লোম্বার্ডগণ অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে নেপোলিয়ন উত্তর হইতে ইতালি আক্রমণ করিয়া কয়েকটি যুদ্ধে অষ্ট্রীয়দিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে ইতালি হইতে তাড়াইয়া দিলেন, নেপ্‌লসের রাজাও পলাইলেন, রোমের পোপের ক্ষমতা অন্তর্ধান করিল, ইতালি আবার তাহার একতা ফিরিয়া পাইল। লোকের আনন্দের সীমা রহিল না। নেপোলিয়নকে ইতালীয়গণ খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করিত।

কিন্তু যে সুখ এবং যে ঐক্য এই জাতি নিজের চেষ্টার দ্বারা অর্জ্জন করে নাই তাহা বেশী দিন স্থায়ী হইল না। নেপোলিয়নের পতন হইল, এবং রাজনৈতিকগণ য়ুরোপের নূতন ভাগ বাটোয়ারা করিলেন, এই নূতন বাটোয়ারাতে ইতালি তাহার আগেকার শাসনকর্ত্তাদের ভাগে পড়িল। তাঁহারা যদিও পূর্ব্বে অত্যাচার করিতেন, কিন্তু নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া তাঁহাদের অত্যাচারের মাত্রা এত বাড়িয়া গেল যে, তাঁহাদের শাসন ইতালিবাসীদিগের অসহ্য হইয়া উঠিল। এই সকল শাসক সম্প্রদায় মনে করিতেন যে জন্তু জানোয়ারের মতন ইতালীয়দিগকে বাঁচিতে দেওয়াই তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অনুগ্রহ।

এই সময় ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে নিস্ নগরে একটি গরীব গৃহস্থের ঘরে গারিবাল্ডির জন্ম হয়। তাঁহার পিতার একটি ছোট ব্যাপারী জাহাজ ছিল। কিন্তু গরীব হইলে কি হয়, গারিবাল্ডির বাপমায়ের মতন সৎ-লোক তখন সেই দেশে ছিল না। জোসেফ গারিবাল্ডি দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন, বুদ্ধি সুদ্ধিও তাঁহার বেশ ছিল; সেইজন্য তাঁহার মা ঠিক করিয়া রাখিলেন যে বড় হইলে গারিবাল্ডি ধর্ম্ম-যাজক হইবে। কিন্তু বালক গারিবাল্ডির মেজাজটা ঠিক ধর্ম্মযাজকের মতন ছিল না। অল্প বয়সেই ইনি সমুদ্রে পলাইয়া গিয়া নাবিক-দিগের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া সাঁতার কাটা, জাহাজ চালানো বিদ্যা প্রভৃতি অল্পদিনের মধ্যেই আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। যখন তাঁহার বয়স মাত্র চৌদ্দ বৎসর, তখন তিনি তাঁহার বাপের সহিত জাহাজে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এবং এগারো বৎসরের মধ্যেই জাহাজের কাপ্তেন হইবার মতন সমুদয় জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি ইতালির ইতিহাস খুব ভাল করিয়া পড়েন এবং তখন হইতেই তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে কেমন করিয়া তিনি এই দেশকে স্বাধীন এবং এক করিবেন। এই ভাবনা হইল তাঁহার আজীবনের সাধনার বিষয়। আজ ইতালি দেশ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে যে প্রতিষ্ঠা ও স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা শুধু কেবলমাত্র গারিবাল্ডির জন্য। এই সময়ে ইতালিকে স্বাধীন করা এবং এককরার স্বপ্ন যাহারা দেখিত তাহারা

স্বাধীন ইতালীর মুক্তির ভেরীনিনাদ।

"নবীন ইতালির" দল বলিয়া বিখ্যাত ছিল; ইঁহারা ছিলেন "সবুজের দল"। গারিবাল্ডি এই দলে যোগ দিলেন; তিনি ছিলেন এই দলের সেরা লোক। মাৎসিনির নাম তোমাদের সকলের জানা উচিত। তিনিও "নবীন ইতালির" দলে ছিলেন।

ইতালিতে পিডমণ্ট এবং সার্ডিনিয়া যুক্ত রাজ্যের রাজা ছিলেন ভিক্টর ইম্যানুয়েল। ইঁহার উদ্দেশ্য ছিল, ইতালিকে এক করা। সেই জন্য গারিবাল্ডির উদ্দেশ্যের সহিত ইঁহার ইচ্ছার কোন বিরোধ ছিল না। গারিবাল্ডি কিন্তু প্রথমে ভুল করিয়াছিলেন, তিনি ভিক্টর ইম্যানুয়েলের অধীনে নৌবিভাগে চাকুরী লইয়া ঠিক করিলেন যে তিনি তাঁহার সৈন্য এবং নাবিকদিগকে হাত করিয়া ভিক্টরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পিডমণ্টে একটি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিবেন, অর্থাৎ সেইখানে প্রজারা নিজেরাই শাসনকার্য্য চালনা করিবে। তিনি যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার জন্য জেনোয়া সহরে আসিলেন, তখন তাঁহার কানে কানে একজন লোক বলিয়া দিলেন "সাবধান, রাজা সমস্ত টের পেয়েছে, তুমি এখন পালাও"। এই কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার সৈনিকের পোষাক ছাড়িয়া একটি সাধারণ চাষার পোষাক পরিয়া জেনোয়া হইতে পলাইলেন। অজানা পথ দিয়া ঘুরিয়া তিনি নিসে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং নিস হইতে ফরাসীদেশের মার্সাই সহরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। সেখানে একটি ইতালির খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিলেন যে রাজা তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। পনেরো বৎসর পর এই রাজাই তাঁহাকে অন্য রকম ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

রাজার এই পরোয়ানার পর তাঁহার ফরাসী দেশে থাকা চলে না, সেই জন্য তিনি আমেরিকায় পলাইয়া গেলেন। সেখানে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণতন্ত্রের অধীনে চাকুরী করিয়া তাহাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন, এই সব যুদ্ধে কত বিপদ ও দুঃখ কষ্টে পড়িয়াছিলেন তাহা এখানে বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহাকে একবার কয়েদ করিয়া হাড়ভাঙ্গা যন্ত্রে ফেলা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি যুদ্ধে কখনও দয়ামায়া বিসর্জ্জন দেন নাই। যখন তিনি ব্রেজিল সহরে ছিলেন তখন তাঁহার সহিত তথাকার আনিতা রিভেয়েরা দে সিল্ভা নামক একটি সুন্দরী রমণীর সহিত পরিচয় হয়। এই পরিচয় ভালবাসায় পাকিয়া উঠিতে বেশী দিন সময় নেয় নাই। পরে তাঁহাদের বিবাহ হইল। আনিতা বীরের পত্নী বীররমণী ছিলেন, স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধে ও সকল আপদ বিপদে সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। এদিকে দক্ষিণ আমেরিকায় যে সকল ইতালীয়গণ বাস করিত, তাঁহারাও গারিবাল্ডির মতন ইতালিকে স্বাধীন করিবার স্বপ্ন দেখিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন গারিবালডির অধীনে ইতালির স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিবার জন্য শপথ লইয়া কোন্ সুযোগে ইতালিতে আসা যায় তাহাই খুঁজিতেছিলেন। অবশেষে সেই সুযোগ আসিল।

১৮৪৮ খৃঃ অব্দে য়ুরোপের অনেক স্থানেই রাজা প্রজার মধ্যে তুমুল লড়াই চলিতেছিল। এই সময়ে ইতালিতেও স্বাধীনতার যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। গারিবাল্ডি ৮৫ জন সহচর এবং দুইটি কামান লইয়া ইতালিতে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার খ্যাতি তখন ইতালির সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, অতএব তাঁহার

আগমনে ইতালির মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। তিনি তাঁহার নিজের জন্মভূমিতে যে অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন তাহা রাজা মহারাজার ভাগ্যে জোটে না। কিছুদিন নিসে থাকিয়া তিনি লোম্বার্ডদিগের পক্ষে যোগ দিলেন, তাহারা তখন প্রাণপনে অষ্ট্রীয়দিগের সহিত লড়াই করিতেছিল, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতে গারিবাল্ডি যুদ্ধ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে রোম হইতে খবর আসিল যে রোমকগণ পোপকে তাহাদের নগর হইতে তাড়াইয়া দিয়া সেখানে গণতন্ত্র স্থাপিত করিয়াছে, গারিবাল্ডি অমনি সেখানে ছুটিলেন, যদিও গারিবাল্ডি দুই একবার শত্রুসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন, কিন্তু পরে ফরাসী সৈন্য যখন রোম ঘেরাও করিল তখন গারিবালডির পলায়ন করা ছাড়া উপায় রহিল না। সঙ্গে তাঁহার বীরপত্নী আনিতা ছিলেন, তিনি অত্যন্ত
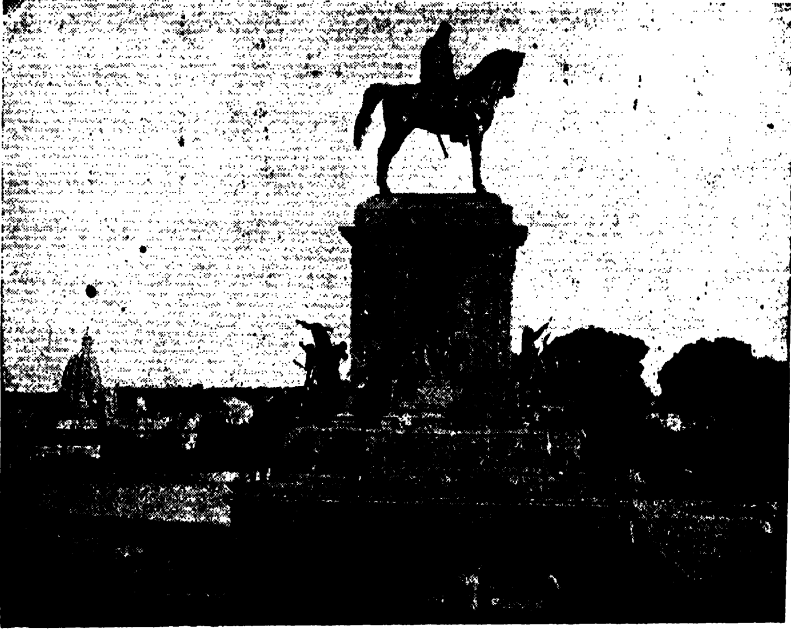
গারিবাল্ডির স্মৃতিস্তম্ভ।

অসুস্থা ছিলেন, কিন্তু আত্মগোপন করিবার জন্য তাঁহার সুন্দর চুলগুলি ছাঁটিয়া একটি বালকের পোষাক পরিয়া তিনি গারিবাল্ডির অনুগামিনী হইলেন। সঙ্গী কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক লইয়া গ্যারিবাল্ডি একটি পাহাড়ে আশ্রয় লইলেন, এই বিপদের সময় কর্ণেল ফোর্বস্ নামে একজন মহানুভব ইংরাজ সেনাপতি তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। গারিবাল্ডির অনুপস্থিতিতে শত্রুগণ এই অল্পসংখ্যক সৈন্যদিগকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল, আনিতা প্রাণপণে লড়িয়াছিলেন, এবং তাহাতে তাঁহার অসুখ খুব বাড়িয়া গেল। গারিবাল্ডি তাঁহার অনুচরদিগকে লইয়া জাহাজে চড়িয়া ভেনিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। ভেনিসে তখন অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলিতেছিল, এই প্রসিদ্ধ নগরের বন্দরে অবস্থান করিয়া তখন অষ্ট্রীয়ার জাহাজগুলি

তোপ ছুড়িয়া ভেনিসকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিতেছিল। গারিবাল্ডির জাহাজগুলি যখন বন্দরে পৌঁছিল তখন অষ্ট্রীয়গণ জ্যোৎস্না আলোকে চিনিতে পারিয়া তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি জাহাজ ধরিয়া ফেলিল, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় গারিবাল্ডি যে জাহাজে ছিলেন তাহা শত্রুর হস্তে পড়ে নাই। বেচারী আনিতা অত্যন্ত অসুস্থা ছিলেন, তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া তীরে নামান হইল, এবং ইহার অল্পক্ষণ পরেই সমস্ত সুখ দুঃখের ভাগিনী গ্যারিবাল্ডির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু ইহলোকের মায়া ত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে চলিয়া গেলেন। ইঁহাকে হারাইয়া গারিবাল্ডির যে কত কষ্ট হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু তাঁহার মতন লোককে বিধাতা শোক করিবার সময় দেন না। তাঁহার মাথার উপর অষ্ট্রীয় সরকার পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল। পিডমণ্টেও তাঁহাকে আশ্রয় দিবার সাহস রাজার ছিল না। আবার তাঁহাকে পলাইতে হইল। আবার তিনি আমেরিকায় পলাইলেন। তাঁহার হাতে টাকা কড়ি কিছুই ছিল না, এই দেশে মোমবাতি তৈয়ারী করিয়া তাঁহাকে অতিকষ্টে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এ অবস্থায় তাঁহার সহিত তাঁহার একজন ইতালীয় বন্ধুর দেখা হইল, তিনি তাঁহাকে ব্যবসার জন্য একটি জাহাজ দেন। এই জাহাজে চড়িয়া তিনি পৃথিবীর অনেক জায়গায় ঘুরিয়া বেড়ান।

একবার এই জাহাজে করিয়া তিনি লণ্ডনে আসেন, সেখানে তাঁহার সহিত মাৎসিনির দেখা হয়। মাৎসিনির নিকট হইতে তিনি অষ্ট্রীয়ার অত্যাচারে জর্জ্জরিত তাঁহার স্বদেশবাসীর দুরবস্থার কথা শুনিয়া চোখের জল ফেলিলেন। অনেক দেশ ঘুরিয়া ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে তিনি আবার স্বদেশে ফিরিলেন। এক বৎসর পরে তাঁহার ভাইএর মৃত্যু হওয়াতে তিনি অনেকগুলি টাকা পান, সেই টাকা দিয়া সারডি-নিয়ার উত্তরে কাপ্রেরা নামে একটি ক্ষুদ্র জনমানবশূন্য দ্বীপ কেনেন। সেইখানে তিনি একটি ছোট বাড়ী তৈয়ারী করিয়া চাষবাসের কাজেই মনোযোগ দিলেন।

কিন্তু সোণার ইতালি তাঁহাকে শয়নে স্বপনে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছিল, তিনি কি ইতালির আহ্বান ভুলিয়া চাষবাস লইয়া থাকিতে পারেন? এদিকে ইতালিতে খুব বড় রকম পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। সার্ডিনিয়ার ও পিডমণ্টের যুক্ত রাজ্যের রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েল ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে সন্ধি করিয়া অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, যুদ্ধে এবার অষ্ট্রীয়ার সম্রাট ভিক্টরের হস্তে পরাজিত হইয়া লোম্বার্ডি দেশ তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন।

নেপল্‌সের বুর্বোঁ বংশীয় রাজার অধিকারে সিসিলি দ্বীপ ছিল। সিসিলিবাসীগণ ১৮৬০ খৃঃ অব্দে তাঁহাদিগের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। গারিবাল্ডি খবর পাইয়া জেনোয়াতে আসিয়া তাঁহার বিখ্যাত হাজার স্বেচ্ছাসেবকের দল গঠন করিলেন, ইত্যালির চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিয়া এই দলে যোগ দিলেন, এই দলে কয়েকজন ডাক্তার এমন কি একজন মহিলাও ছিলেন। এই দল লইয়া তিনি জাহাজে করিয়া সিসিলিতে আসিয়া পৌঁছিলেন। গারিবাল্ডি যে শুধু একজন স্বদেশ হিতৈষী বীরপুরুষ ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার মতন বড় সেনাপতিও তখনকার দিনে কেহই ছিল না। যদিও শত্রুপক্ষে সৈন্য সংখ্যা তাঁহার সৈন্য সংখ্যা অপেক্ষা বহুগুণ ছিল, তথাপি তিনি কৌশলে শত্রুসৈন্যের চোখে

ধূলি দিয়া সিসিলির রাজধানী পালের্মো অধিকার করেন। এই সংবাদ যখন ইতালিতে ছড়াইয়া পড়িল তখন চারিদিক হইতে স্বেচ্ছাসেবক তাঁহার দলে ভিড়িতে লাগিল। এই সময়ে অজস্র টাকাও তাঁহার হাতে আসিল। তিনি উভয়েরই যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। সমস্ত সিসিলি জয় করিয়া তিনি ইতালিতে আসিয়া অল্প যুদ্ধ করিয়াই নেপল্‌স্ অধিকার করিলেন। এখন ইচ্ছা করিলেই তিনি ইতালির রাজা হইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার রাজপদে কোন লোভ ছিল না, তিনি বিজয়ীর বেশে নেপল্‌স প্রবেশ করিয়া সার্ডিনিয়ার রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে সমগ্র ইতালির রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া সামান্য টাকা এবং কিছু ধান লইয়া চাষবাসের জন্য কাপ্রেরা দ্বীপে চলিয়া গেলেন।

গারিবালডি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন অধীন জাতির দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। এক সময়ে যখন তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সরকার হইতে তিনি কয়েক লক্ষ টাকা পান, সরকার তাহার জন্য বাৎসরিক ১৫০০০৲ টাকা একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন।

তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার লণ্ডনে আসেন, শতসহস্র লোক সেখানে তাঁহাকে বীর বলিয়া পূজা করিবার জন্য ছোটে; প্রশংসা কিংবা নিন্দাবাদ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। "হাজারের" দলপতি-স্বরূপ তিনি ধূসর রঙের পেণ্টলুন এবং লাল সার্ট পড়িতেন; এই সাদা সিদে পোষাক পরিয়া তিনি যখন লণ্ডনের পথে বাহির হইতেন তখন সেখানকার সর্ব্বাপেক্ষা বড় বড় লোক তাঁহার সম্মান করিয়া নিজেদিগের সম্মান বাড়াইতেন।

মহাত্মা গান্ধী নেংটি পরিয়া থাকেন, তোমার পোষাক তাঁহার পোষাক অপেক্ষা অনেক ভাল, কিন্তু কাহাকে আজ পৃথিবী সম্মান করে, তোমাকে না মহাত্মা গান্ধীকে?

লোক গারিবল্ডিকে সম্মান করে, ভক্তি করে—তাঁহার মহাপ্রাণতার জন্য, তাহার স্বদেশপ্রেমের জন্য। সকল দেশের সকল কালের লোক স্বদেশ প্রেমিককে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দেয়। ইঁহাদের দেহ যদিও মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তথাপি ইঁহাদের আত্মা অবিনশ্বর।
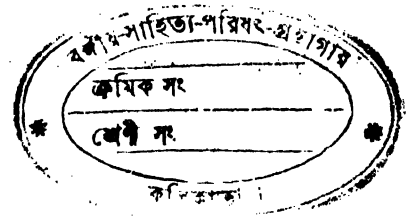
ষ্টেসন মাষ্টার।

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ।)

১

মাঠের মাঝে লম্বা লাইন শ্যামল দুপা'শ তার
হতে আমার ইচ্ছে করে ষ্টেসন মাষ্টার।
ওই যে ছোট বাসা
জাগায় ভালবাসা
ওইটী পেলেই থাম্‌বে আমার অনন্ত আব্‌দার।

২

ও ঘর যেন অজানা কোন্ রহস্যেরি পুর
জান্‌লা দিয়ে উপ্‌ছে শিশুর হাস্য সুমধুর।
ঘোমটা ঢাকা মুখ
স্বর্গেরি যৌতুক,
দৃষ্টিতে হয় বৃষ্টি তাহার মিষ্টি মতিচুর।

৩

আস্‌বে যাবে নিত্য গাড়ী—চলন্ত এক দেশ
ঘণ্টা কয়েক গৃহস্থালী দেখতে লাগে বেশ।
দেখবো ছবি কত
বায়স্কোপের মত
গীত ফুরালে রইবে কাণে শেষ কলিটার রেশ।

৪

ইহার চেয়ে আর বেশী কি অধিক মজা চাই
কাল্‌কা এবং দিল্লি দ্বারে থাকবে হাজির ভাই
বাড়বে নিতুই চেনা
ভাবের লেনা দেনা
মন যে আমার বস্‌বে ভাল ওইটী যদি পাই।

৫

ডাক গাড়ীটা আসবে ছুটে বিদ্যুতেরি মত
গরবে তার পা পড়েনা, দেমাক্ টা তার কত।
স্বপ্ন সুখের সম
ক্ষণিক অনুপম
দাপটে তার কাঁপবে ধরা—দেখতে দূরগত।

৬

মাল গাড়ীটা বোঝাই লয়ে চলবে সারারাত
মজুর মুটে আলাপ বড় নাইক কারো সাথ।
খাদ্য রসদ আনে
কেই বা তারে জানে
মানুষ মোরা সত্য বড় নিমকহারাম জাত।

৭

রাত্রিতে হায় ছাপর খাটে রইবো শুয়ে একা।
স্বপ্নে পাবো সিন্দুবাদ ও আলাদীনের দেখা।
হবে জীবন মম
আরব নিশির সম,
অদৃষ্টেরি সঙ্গে মিলন অদৃষ্টেরি লেখা।
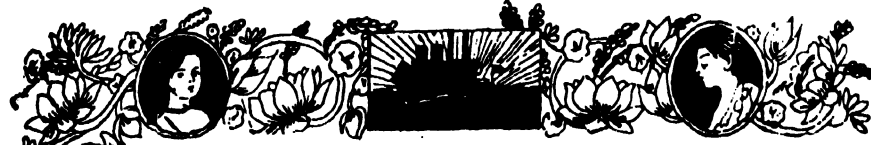
পরেশনাথ পাহাড়

(শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু)

কলিকাতায় যারা থাক তাহাদের মধ্যে অনেকেই পরেশনাথের মিছিল দেখিয়া থাকিবে; সে মিছিলে সোণা রূপা ও হাতীর দাঁতের তৈরী কত সুন্দর সুন্দর জিনিস, জরীর মখমলের কত বিচিত্র সাজসজ্জা, কত ধ্বজা, চামর বাজনাবাদ্য, কত সমারোহ ব্যাপার! আবার একটা নয়, দুইটা মিছিল সহরের দুইদিক দিয়া যায়। পল্লীগ্রামের ছেলেরাও বাংলা ভূগোলে কলিকাতার দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে পরেশনাথ মন্দিরের ছবি এবং নাম দেখিয়াছ। সে মন্দির এবং তার চারিধারের বাগানে কতই না শিল্প-পরিচয়, কত পাথরের পরীর মূর্ত্তি, চমৎকার সরোবর, জলের ফোয়ারা, আর বিদ্যুৎ আলোর কেমন ব্যবস্থা! হঠাৎ ঢুকিয়া মনে হয়, বুঝি কোন রাজামহারাজার প্রমোদোদ্যানে আসা গেল।

যাঁর নামে বিলাসিতার এত আয়োজন, বৎসরে বৎসরে এত ধূমধাম, সেই পরেশনাথ—কে ছিলেন জান? একজন সংসারত্যাগী সাধু; তিনি এবং মহাবীর নামে আর একজন সন্ন্যাসী জৈনধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। জৈনদের মধ্যে দুইটি দল আছে; একদল পরেশনাথকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করেন, আর একদল মহাবীরের উপাসক। এই জৈনদের মধ্যে একজন আদর্শ পুরুষের আজ আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁর জীবন এত পবিত্র এত সুন্দর যে পৃথিবীর লোক তাঁর নাম দিয়াছে, এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব। তাঁর সঙ্গে এক দণ্ড যে মিশিয়াছে সেই খাঁটি লোক হইয়া গিয়াছে। আমি বলিব না, তোমরা বল—কে তিনি।

তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কিনা জানি না, পরেশনাথের প্রতিমূর্ত্তি সোণার, অথচ তাঁর গায়ে না আছে একখানি অলঙ্কার, পরনে না আছে একটুকরা কাপড়। আগেই বলিয়াছি, তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন। এক পাহাড়ের নিবিড় গুহায় বহুদিন ধরিয়া তিনি কঠিন তপস্যা করিয়াছিলেন, তারপর যখন সিদ্ধিলাভ হইল, তখন তাঁরই নামে সেই পাহাড়ের নামকরণ হইল—পরেশনাথ। এই পরেশনাথ জৈনদের তীর্থ, বাঙ্গালীরাও এখানে বেড়াইতে যায় জায়গাটি বেশ মনোরম বলিয়া। কলিকাতার মনুমেণ্ট-এর উচ্চতা দুইশত ফুটের মধ্যে, আর পরেশনাথ পাহাড় নাকি চারহাজার

ফুট উচুঁ। বি, এন আর-এর গোমো ষ্টেশন হইতে বেশ স্পষ্টই দেখা যায়, গিরিডি হইতেও মন্দ দেখায় না; সুদূর মধুপুর হইতেও দেখিয়াছি নির্মেঘ দিগন্তের কোলে পরেশনাথের নীলরেখা পরিষ্কার দেখা যাইতেছে।

গিরিডি হইতে এক দিন সন্ধ্যার সময়ে এই বিখ্যাত পরেশনাথ পাহাড় দেখিতে আমরা যাত্রা করিয়াছিলাম, কিসে জান? গরুর গাড়ীতে। রাস্তা এমনি সুন্দর আর গাড়ী এমনি ভালো যে আঠার মাইল পথ যাইতে আমাদের কোন কষ্ট হয় নাই। চাঁদের আলোয় হাজারি-বাগ রোড দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন এক খানা ধবধবে সাদা চাদর কে পাতিয়া রাখিয়াছে, মাঝে মাঝে গাছের পাতায় একটু আধটু ছায়া পড়িয়াছে, মাঝে মাঝে সুগন্ধ বনফুল পথের ধারে ফুটিয়া রহিয়াছে। মাঠের শেষে কোথাও নিদ্রিত গ্রাম, কোথাও নিস্তব্ধ পর্ব্বতশ্রেণী, নীল আকাশের এখানে ওখানে শুভ্রমেঘে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি। বরাকর নদীর তীরে গিয়া ভোর হইল। অত সকালে বনে বনে পাখীদের রঙের বাহার, গলার স্বর, বলত কেমন লাগে? পাহাড়ের তলায় যখন পৌঁছিলাম তখন বেশ বেলা হইয়া গিয়াছে।

পাহাড়ের নীচে হইতে পরেশনাথ মন্দিরের দৃশ্য।
(লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত)

সে জায়গাটার নাম মধুবন, সেখানে যাত্রীদের থাকিবার বাড়ী আছে, পাহাড়ের পথ দেখাইবার লোকও সেখানে পাওয়া যায়। একটা বাড়ীতে আমরা সকলে নামিয়া বিশ্রাম করিয়া খাওয়ার যোগাড় দেখিতে লাগিলাম। নানারকম গল্পগুজবে হাসি খেলায় সেদিনটা সেখানেই কাটিল। পরদিন ভোর ৬টার সময় দল বাঁধিয়া পাহাড়ের পথে যাত্রা করা গেল।

সে পথে উঠিতে কি পরিশ্রম! যেমনই খাড়াই, তেমনি ঘন গাছপালায় অন্ধকার। যার দেহের ওজন যত বেশী, তার উঠিতে তত কষ্ট। ঘুরিয়া ঘুরিয়া গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়া পথ দেখিয়া চলিতে হইল। অনেক রাত্রে সেখানে নাকি বাঘ বাহির হয়।

পাঁচমাইল রাস্তা পার হইবার পরে একটা ডাক বাঙ্‌লা মিলিল। ঘরের চাবি খুলিয়া বসিয়া একটু বিশ্রাম করা গেল। আবার যাত্রা করিয়া পাহাড়ের চূড়ায় মন্দিরে পৌঁছিয়া দেখিলাম সব শুদ্ধ চার ঘণ্টা কুড়ি মিনিট লাগিয়াছে। সমস্ত পথটা প্রায় ছয় মাইল।

তোমরা দেখিবে বলিয়া এখানে মন্দির ও ডাকবাঙ্‌লার ছবি তুলিয়া দিলাম। মন্দিরের মধ্যে পরেশনাথের দুখানি পায়ের চিহ্ন আছে, শুধু এই দেখিতে কত দূর-দূরান্তর হইতে কত লোক কত কষ্ট করিয়াই না আসে! মহাপুরুষদের সকলেই শ্রদ্ধা করে, কিন্তু তাঁহাদের আদর্শের মত সত্যের পথটিকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না, এই যা দুঃখ।

পরেশনাথ পাহাড়ের উপর ডাক বাঙ্‌লা।

(লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত)

পরেশনাথ পাহাড়ে উঠিলে বেশ বোঝা যায়, এরোপ্লেনে চড়িয়া পৃথিবীটাকে কেমন দেখায়! মাঠের ঘাসের সঙ্গে যেন বড় বড় গাছের মাথাগুলা মিশিয়া গিয়াছে, তাছাড়া ঘরবাড়ী, পথঘাট, টেলিগ্রাফের থাম, রেলের লাইন সব যেন সেই 'লিলিপুট'দের দেশের। এত উঁচুতে উঠিলে মনও এমন উঁচু হইয়া যায়, যে ঈশ্বর ছাড়া আর কারুর কথা তখন মনে পড়ে না, খোলা আকাশের মাঝখানে দাঁড়াইয়া তাঁরই স্তব গান করিতে আনন্দ হয়।

দেড় ঘণ্টা ধরিয়া সব দেখিয়া শুনিয়া নামিতে আরম্ভ করা গেল। তিন ঘণ্টার মধ্যে সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া দারুণ ক্ষুধায় আহারের আয়োজন এবং তারপর গোযানে আরোহণ। কিন্তু গিরিডিতে ফিরিয়া গরুর গাড়ীর কল্যাণে সর্ব্বাঙ্গে কি রকম ব্যথা হইয়াছিল, সে কথা তুলিয়া আর অপ্রস্তুত করিও না।

অবোধ রাজপুত্র

(রূপকথা)

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

সে এক রাজকুমার—গিয়াছিল গহন বনে শিকারে। দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি—সারাদিন পরিশ্রমের পর একটি শিকারও তার জুটিল না। বিষণ্ণ মুখে পরিশ্রান্ত রাজকুমার বনের এক প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় সমস্ত বন আলো করিয়া এক দিব্য কান্তি-সম্পন্ন সুন্দরী আসিয়া রাজকুমারের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার অপরূপ রূপে চারিদিক ঝলমল করিয়া উঠিল। হাতে তাহার তীর-ধনুক, পরণে দোলন সাড়ী, মাথায় ফুলের উষ্ণীষ। ধীর পাদবিক্ষেপে আসিয়া সে রাজকুমারের সম্মুখে দাঁড়াইল, যেন কত কালের পরিচয়, কত দিন পরে দেখা হইয়াছে, বলিল,

"কুমার, শিকার একটাও কি পান নাই? বড্ড ঘন বন, তাতে আপনি এ বনের পথ ঘাট কিছুই জানেন না, আসুন আমার সঙ্গে—" কুমারের উত্তরের অপেক্ষা পর্য্যন্ত না করিয়া সুন্দরী পথ দেখাইতে অগ্রসর হইল। কুমার ত হতভম্ব! এই অসামান্যা সুন্দরী বনবালা কে? কোথায় তাহার বসতি? কি তাহার অভিপ্রায়? চলি চলি করিয়াও তাহার পা উঠিতেছিল না। সে এক দৃষ্টে বনবালার দিকে চাহিয়া ছিল; এমনি আরও কতক্ষণ সে বনবালার দিকে তাকাইয়া থাকিত বলা যায় না। সহসা মনে হইল বনবালা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে, একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ আসিয়া অভদ্রভাবে তাহাকে দৃষ্টির অন্তরালে টানিয়া লইয়া গেল। আবার দূরে, অতিদূরে বনবালা দেখা দিল; ঐ-যে কে দাঁড়াইয়া কুমারকে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে; আর কি কুমার স্থির থাকিতে পারে? তাহার বিস্ময়ভাব চলিয়া গেল—ঊর্দ্ধশ্বাসে সে বনবালার উদ্দেশে ঘোড়া ছুটাইল।

অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত বনবালা কুমারকে লইয়া জঙ্গলটা তোলপাড় করিয়া ফেলিল। কত যে শিকার কুমারের অব্যর্থ তীরের সম্মুখে পড়িল তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে সমস্ত দিনের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করিতে দুই অপরিচিত বন্ধু আসিয়া বনের এক প্রান্তে বসিল। পশ্চিম গগন তখন রাঙা রঙে রঞ্জিত হইয়াছে, আকাশে বাতাসে তখন কি যেন এক অপরূপ স্নিগ্ধ ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সময়ের সেই মহামিলন কালে দুইটি হৃদয় পরস্পরকে আত্ম নিবেদন করিল। জীবনের কত সুখ দুঃখের কথা, কত আশা ও আকাঙ্খার কাহিনী বলিতে বলিতে রাত্রীর অন্ধকার ঘন হইয়া আসিল। বনবালা ভুলিল যে তাহাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে হইবে, রাজকুমার ভুলিল যে তাহার সহচরেরা আকুল আগ্রহে বনের বাহিরে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। বিদায়ের কত সময় আসিল, গেল, কিন্তু বিদায় লওয়া আর হইল না। দুইজনই দুইজনকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া

"কুমার, শিকার একটাও কি পান নাই..."

ফেলিয়াছিল, কি করিয়া বিদায় লইবে! ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া সেই গভীর নিশীথে রাজকুমার দুঃখিনী বনবালাকে বিবাহ করিল।

রাজকুমার আর রাজ্যে ফেরে নাই। বনের মধ্যে ফল-মূল খাইয়া, রাখাল বালকদের সঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া, বনবালাকে লইয়া কুমার পূর্ণ দুইটী বৎসর কাটাইয়া দিল। সৌন্দর্য্যের উপাসক রাজকুমার এই দুই বৎসর সে সৌন্দর্য্য পুরামাত্রায়ই ভোগ করিল। প্রকৃতির হাত হইতে কুমার প্রথম পুরস্কার পাইল বনবালা, দ্বিতীয় এক জীবন্ত ফুটন্ত শিশুসন্তান। কুমারের, বনবালার সে কি আনন্দ—সে কি অনাবিল স্ফূর্ত্তি! তাহাদের রূপ ছিল, রূপে মাধুরী ছিল, কিন্তু এই যে সুন্দর শিশুটী জন্মিল, ইহার রূপের পরিচয় দেয় কে? সুন্দর দেখিয়া কুমার বনবালাকে বিবাহ করিয়াছিল। পিতার কথা ভাবে নাই; একটা প্রকাণ্ড রাজ্যের কথা ভাবে নাই আর আজ ফুটন্ত কলিকা অপরূপ সুন্দর তাহারই প্রতিমূর্ত্তি তাহার পুত্রকে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইল।

কিন্তু চিরকাল সুখের হয় না। কে জানিত প্রকৃতির কোলেও দুঃখের করাল ছায়া আসিয়া হানা দিবে? একদিন বনপ্রান্তে রাজকুমারের সঙ্গে দেখা হইল রাজ্যের সসৈন্য প্রধানগণের—রাজকুমার রাজঐশ্বর্য্যের মোহে তাহার স্ত্রী ভুলিল, পুত্র ভুলিল—বনের কথা আর তাহার মনে রহিল না সে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল রাজপুরীর দিকে। বনবালা তাহার বনসহচরদের নিকট সব শুনিয়া নিভৃতে চোখের জল মুছিল—দুঃখিনী—চিরদুঃখিনী বনবালার যে বলিবার আর কিছুই ছিল না। তাহার শেষ সম্বল পুত্রটির বুকের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া তাহার মর্ম্মবেদনা সে পরমেশ্বরের নিকট জানাইত – অভাগিনীর এইই ছিল শ্রেষ্ঠ সম্বল—শেষ নির্ভর।

সারা বন কিসের একটা কলরব-কোলাহলে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। কিসের যেন একটা আনন্দ রব, কিসের যেন একটা শোক ধ্বনি—মুমূর্ষুর আর্ত্ত-নিনাদ ও বীরের বিজয় নির্ঘোষ এক মুহূর্ত্তে আকাশে বাতাসে মিশিয়া সমস্ত কাননটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে। কিসের এ কলরব, কিসের এ কোলাহল ধ্বনি? বৃদ্ধ রাজা আসিয়াছেন শিকারে! তাঁহার প্রাণপ্রতিম একমাত্র কুমার যুবরাজ কালের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে, শোকে দুঃখে মুহ্যমান রাজা আহার নিদ্রা ভুলিয়াছিলেন, রাজ কার্য্যে মন উঠিত না। তাই মন্ত্রী পারিষদেরা মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন শিকারে—তাঁহার বিশ্রান্ত মনকে কিছুকালের জন্য শান্ত করিতে।

শিকারের স্ফূর্ত্তি—শিকারের উত্তেজনায় কিছুতেই যেন রাজার মন উঠিতেছিল না। শিকারের আনন্দ রব, বাদ্য ধ্বনি—প্রকৃতির সে উগ্র মূর্ত্তির সকলই যেন তাঁহার নিকট একটা প্রহেলিকা বোধ হইতেছিল—

বনানির অন্তর্নিহিত প্রশান্ত স্তব্ধ ভাব সেই অবসরে তাহার শূন্য মনকে একেবারে পাষাণ করিয়া তুলিয়াছিল। শিকারের দিকে রাজার মন ছিল না, শূন্য মনে ঘুরিতে ঘুরিতে মন্ত্রিগণকে ছাড়িয়া তিনি বহুদূরে আসিয়া পড়িলেন। হিংসা—জীঘাংসা সব ভুলিয়া রাজা বিরলে প্রকৃতির সৌম্যমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আছেন, এই সময়ে শরাহত এক উন্মত্ত বরাহ সহসা অসতর্ক রাজাকে আক্রমণ করিল। রাজা ধনুকে তীর যোজনা করিবার সময় পাইলেন না, তরবারি কোশেই রহিয়া গেল—মুহূর্ত্তের মধ্যেই বন্য বরাহ রাজাকে বুঝি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে।

রাজার শরীরে ছিল শত হস্তীর বল, তাঁহার সঙ্গে জোঝে এমন জীব হয়ত পৃথিবীতে ছিল না। কিন্তু বাঁচিতে তাঁহার আর সাধ ছিল না—পুত্র শোকে তিনি আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন. মারণোদ্যত বরাহকে বাধা দিতে তিনি অঙ্গুলিমাত্র সঞ্চালন করিলেন না! রক্তপীপাসু বরাহ উন্মত্ত হইয়া রাজাকে বুঝি বা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে, আর এক মুহূর্ত্ত কাল, বুঝি বা তাহার মধ্যেই রাজার শেষ নিঃশ্বাস বহিয়া যায়! সহসা একটি তীক্ষ্ণধার তীর আসিয়া বরাহের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিল! সঙ্গে সঙ্গে বরাহের ইহলীলা সাঙ্গ হইয়া গেল। রাজা বিস্ময়ে ফিরিয়া দেখেন যে তীর ধনুক হাতে এক অপরূপ সুন্দর বলিষ্ঠ যুবক—কি সুন্দর দেহের গঠন—কি প্রশস্ত ললাট! স্নেহের কি যে একটা তাড়না তাঁহার মনকে আলোড়িত করিতেছিল তাহা অনুভব করিবার শক্তি বোধ করি তাঁহার নিজেরই ছিল না। রাজা আকুল আগ্রহে যুবকের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বিশ্বের স্নেহ ও মমতা আসিয়া রাজার বুককে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। কি এক অহেতুক উত্তেজনায় অধীর হইয়া রাজা যুবককে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "যুবক, কেন তুমি আমায় বাঁচাইলে? তোমাকে চিনি চিনি করিয়াও চিনিতে পারিতেছি না—তুমি কে?"

যুবক নিজের পরিচয় দিল,—সে রাখাল বালক বটে, তথাপি সে রাজপুত্র—মা মৃত্যুশয্যায় বলিয়া গিয়াছেন, রাজরক্ত তোমার ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে, দেখিও যেন সে রাজরক্তের অবমাননা করিও না। রাজরক্ত—রাজপুত্র,—রাজার বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল। যুবককে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখেন যুবকের কপালে রাজ তিলক! যুবক তাহার মাতার নিকট নিজের জীবনের ইতিহাস যেমন যেমন শুনিয়াছিল তাহাই বলিল। রাজার মুখে আর বাক্য ছিল না—তাঁহার ধমনীতে বুঝি বা রক্তও আর বহিতেছিল না—হৃদয়কে যথাসাধ্য শান্ত করিয়া প্রাণপণে তিনি যুবককে বুকে চাপিয়া ধরিলেন—বলিলেন, "বাছারে, কোথায় ছিলি এতদিন—আমার রাজ্য, ধন, মন, প্রাণ সব যে তোর বিহনে শ্মশান হইয়া গিয়াছে—চল যাই রাজ্যে ফিরিয়া—তুই যে আমার জীবনের ধ্রুবতারা—রাজ্যের আশা ভরসা—যুবরাজ।"

রাজার দুই গণ্ড বাহিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল, রাজা যে আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছেন।

* * * *

কাল কুমার রাজা হইবেন, আজ অধিবাস। বৃদ্ধ রাজা মৃত্যু শয্যায় রাখাল বালককেই যুবরাজ

বলিয়া অভিষেক করিয়াছেন। রাজ্যের প্রধানেরা বৃদ্ধ রাজার শেষ আদেশ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

আজ অধিবাস—কাল রাজাভিষেক। রাজ্যের সর্ব্বত্র আনন্দ উৎসব চলিয়াছে, সবাই মহোৎসবে মাতিয়াছে। রাজ-অন্তঃপুরে আজ বিরাট সমারোহ ব্যাপার। চারণ বালকেরা গীত গাহিতেছে, বাদ্যকরেরা বাজাইতেছে, পুরোহিতগণ বেদ পাঠ করিতেছেন। কিন্তু কুমারের মন সে দিকে ছিল না। দেশ বিদেশ হইতে আরও প্রধানেরা যে কত মূল্যবান উপঢৌকন আনিয়াছে তাহাই পরীক্ষা করিতে কুমার ব্যস্ত। আজন্ম রাখালবালকভাবেই সে বর্দ্ধিত—ঐশ্বর্য্যের কোলে নয়; তাই ঐশ্বর্য্যের মোহ মাদকতা তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। মণিমাণিক্য অলঙ্কারাদি, মূল্যবান পরিচ্ছদ, কত কি স্তূপীকৃত ভাবে রাজার কোষাগারে সজ্জিত রহিয়াছে, কুমার আজ সব কাজ ভুলিয়া গিয়া সেই সকল লইয়াই রহিয়াছে।

কোথা হইতে একটি অপূর্ব্ব চিত্র আসিয়াছে, কুমার অবাক হইয়া সেই দিকে তাকাইয়া শিল্পীর অসাধারণ প্রতিভার কথা ভাবিতেছে। কোন এক ভাস্কর শিল্পী তাহার শ্রেষ্ঠ সাধনার ফল এক প্রস্তর মূর্ত্তি কুমারকে উপঢৌকন দিয়াছেন। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যায়, তথাপি কুমারের খেয়াল নাই, সেই মূর্ত্তির দিকেই এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে। চাহিয়া চাহিয়াও তাহার সাধ মেটে না—বুঝি বা তাহার সব সৌন্দর্য্যটাই সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে চায়। অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া, প্রস্তর মূর্ত্তিটীকে বুঝিবা বাস্তব ভ্রমেই সে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, পরক্ষণে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া বিষণ্ণ বদনে বসিয়া পড়িল; এমনি করিয়া অধিবাসের সারা রাত্রি কাটিয়াছে। কি যেন একটা অতৃপ্ত সৌন্দর্য্যের মোহে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। পিতার মতই তাহার চিত্ত চঞ্চল, আবার মাতার মতই সে স্থির ধীর।

রাত্রি প্রায় শেষ হয় ভোরের আলো তখনো ভাল দেখা দেয় নাই—কুমার শ্রান্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন সে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিল।

তন্দ্রার ঘোরে কুমার দেখিল—

রাতের আলো নিবিয়া গিয়াছে—ভোরের আলো উঁকিঝুঁকি মারিতেছে—ইহারই মধ্যে কৃষক লাঙ্গল লইয়া ক্ষেতে নামিয়াছে—তাহার পর গলদঘর্ম্ম হইয়া বেলা দ্বিপ্রহরে সেই মাঠের মধ্যে দুইটি শুক্‌না ভাত মুখে করিয়া আবার লাঙ্গল লইয়া কাজে লাগিয়া গেল। দিনমানে এই হাড়ভাঙ্গুনি পরিশ্রম, আর রাত্রে অভাবের তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত এই ছিল সেই কৃষকের দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস। অন্ন—লক্ষ্মী লইয়া কৃষকের কারবার, কিন্তু এমনই যুগের ধর্ম্ম কৃষকের বাড়ীর ত্রিসীমানাতেও লক্ষ্মী ঘেসে না, ক্ষেতের ফসল কখনও ঘরে উঠে না, চারিদিকে অভাব-রাক্ষসীর তাড়না, শিশুরা খাইতে না পাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনর্থ করে। এই সুযোগে মহাজনেরা আসিয়া দাদন দিয়া ক্ষেতের ফসল দখল করিয়া
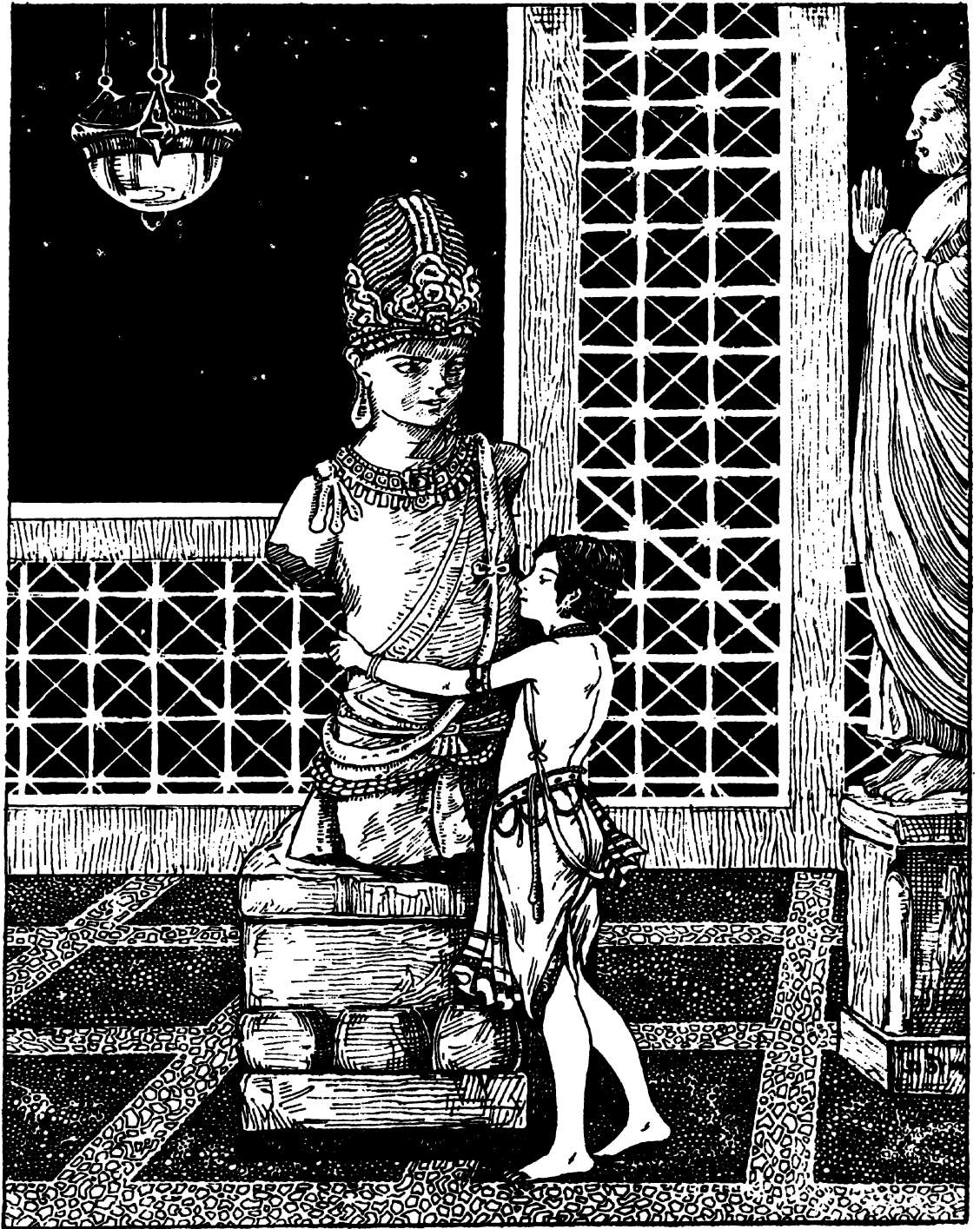
অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া প্রস্তর মূর্ত্তিটাকে বুঝিবা বাস্তব ভ্রমেই জড়াইয়া ধরিয়াছিল

বসিল। বেচারা কৃষক—মূর্খ কৃষক! সে কি জানিত কত মূল্যে তাহার ঐ ক্ষেতের চাউল বাজারে বিকায়! ক্ষেতের ফসল যখন ঘরে উঠিল তখন মহাজনেরা আনন্দে অধীর হইয়া সেই ফসল কাটিয়া লইয়া গেল—পরিবর্ত্তে কয়েকটা মুদ্রা দিয়া গেল কৃষককে। টাকার দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়িল না, সবারই দৃষ্টি ছিল—সেই দুগ্ধ ফেননিভ—অতি চিক্কণ—সুশ্রী—রাজভোগ চাউলের উপর। কৃষক পুত্রেরা সেই চাউলের আস্বাদ উপভোগ করিবার জন্য আকুলি বিকুলি করিতে লাগিল। কৃষক পত্নী সেই চাউলের ঘ্রাণে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। আর আপনার ক্ষেতের চাউল অন্যকে দিয়া কৃষক নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

কুমার স্বপ্নের ঘোরে মহাজনদের বলিল—"এই বেচারা কৃষক সারা বৎসর খাটিয়া নিজের ক্ষেতে এই চাউল উৎপন্ন করিয়াছে—তোমরা লইয়া যাও কোন লজ্জায়—তোমরা কি এই চাউল মুখে দিতে পারিবে?"

মহাজন উত্তর করিল, "এ রাজভোগ চাউল—রাজভোজে কুমার এই চাউলের পায়স খাইবেন।"

কুমার বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া জাগিয়া উঠিল।

আবার কুমার তন্দ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া স্বপ্ন দেখিল, সে যেন কোন এক দূর বিজন গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছে। যাইয়া দেখে সেখানে অতি দরিদ্র ভিক্ষুক একখানি কুড়ে বাঁধিয়া বাস করে। তাহার দিন আনিতে দিন কুলায় না—কোন প্রকারে একবেলা খাইয়া সে বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতেও তাহার নিস্তার নাই—এক ধনী আসিয়া তাহার নিকট টাকা দাবী করিল। ভিক্ষুক তাহার শূন্যভাণ্ড উবুড় করিয়া দেখাইল, কত কাকুতি মিনতি করিল, কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী—সেই পুরুষ তাহার যাহা কিছু ছিল ওলোট পালোট করিয়া—বসনাদি যাহা ছিল তাহার ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া লইয়া গেল। সে দিন সেই ভিক্ষুকের আর আহার হইল না—তাহার মুখের অন্ন ঐ দুর্দ্দান্ত পুরুষ কাড়িয়া লইয়া গিয়াছিল। বিস্ময়ে অধীর কুমার এই তাজ্জব ডাকাতি দেখিতেছিল, কিন্তু সহসা তাহার মনে হইল, সেই ভিক্ষুক ত একা নয়, সেই এক ভিক্ষুক হইতে যেন শত সহস্র ভিক্ষুক আসিয়া জন্মিল, দেখিতে দেখিতে আকাশ পাতাল এই ভিক্ষুকের দলে ছাইয়া গেল—ফিরিয়া দেখে সেই বীর্য্যবান পুরুষ আর সেখানে নাই, তাহার পরিবর্ত্তে রহিয়াছে, রাজ্যের যত ধনী সৈন্য সেনাপতি। ভিক্ষুকের দলকে দেখিয়া ধনীর দল হুঙ্কার দিয়া উঠিল, "লইয়া আইস তোমাদের টাকা—তোমাদের কাকুতি মিনতি আমরা শুনিতে চাই না। আমাদের ত পেট চলা চাই—আমাদের বাবুয়ানাও ষোল আনা বজায় রাখা চাই।" ভিক্ষুকের দল, যাহার যাহা ছিল দিল,—কিন্তু তাহাতেও রাজকর্ম্মচারীদের মন উঠিল না, তাহারা তাহাদের শেষ কপর্দ্দক, শেষ মুখের অন্ন, শেষ বসনটি পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইল—লইবে না—তাহারা যে ধনী—তোমরা যে সে রসে বঞ্চিত।

কুমার দেশের এক শ্রেণী লোকের এই অনাচার দেখিয়া ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায় হুঙ্কার দিয়া উঠিল—তাহার স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গেল—চাহিয়া দেখে সে শয্যায় শুইয়া।

আবার কুমার স্বপ্ন দেখিল। কোন এক ব্যবসায়ী চলিয়াছে সমুদ্রে তরী ভাসাইয়া, সঙ্গে লোক-লস্কর—ক্রীতদাস। মাঝ সমুদ্রে আসিয়া সেই বিরাট বাহিনী থামিল; কর্ত্তা তখন হুকুম দিল, এখনই ক্রীতদাসটাকে ডুবুরীর পোষাক পরাইয়া জলে নামাইয়া দেওয়া হউক। সঙ্গে সঙ্গে বেত্রাঘাত দ্বারা এই হুকুম তাহার অনুচরেরা ক্রীতদাসকে জানাইয়া দিল। ক্রীতদাস ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ডুবুরির পোষাক পরিয়া জলে নামিয়া পড়িল। কতক্ষণ বাদে সে রিক্ত হস্তে উপরে উঠিয়া আসিল। এত বড় অপরাধ এই ভৃত্যের, সে কিনা রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসে! তীব্র বেত্রাঘাতে তাহার শরীর জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। আবার তাহাকে জলে নামাইয়া দেওয়া হইল। এবার আর সে শূন্য—হাতে ফিরিল না—মূল্যবান মুক্তা লইয়া সে প্রভুর নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে। সে এবার মনের সব একাগ্রতা জড় করিয়া ঈশ্বরকে ডাকিয়াছিল—আর তার জীবনের আবশ্যক নাই—তবে মরিবার আগে সে শেষ বারের জন্য তাহার প্রভুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া যাইতে চাহে—তাহার জীবনের পরিবর্ত্তে ঈশ্বর যেন তাহার এই প্রার্থনা পূর্ণ করেন। সে ঐকান্তিক প্রার্থনা বুঝি বা ঈশ্বর সমীপে পৌঁছিয়াছিল।—এবার সে মুক্তার সন্ধান পাইয়াছিল. সেই মুক্তার বোঝা প্রভুর পায়ের তলায় নামাইয়াই—সে তাহার আজীবনের দুঃখের বোঝা শেষ করিল। অত্যধিক পরিশ্রমে তাহার জীবনীশক্তি বহুপূর্ব্বেই লোপ পাইয়াছিল—মুক্তা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার শেষ নিশ্বাস বহিয়া গেল।

কিন্তু—আমাদের ঐ ব্যবসায়ী প্রভুর সে দিকে দৃষ্টি দিবার সময় ছিল না। কত মূল্যে ঐ মুক্তাটি বিকাইবে সেই চিন্তাই তখন তাহার বড় হইয়াছিল। কুমার—এই অদ্ভুত নৃশংসতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, বিস্ময়ে সেই বণিককে জিজ্ঞাসা করিল, এই মুক্তা লইয়া সে কি করিবে?

"রাজ-মুকুটের উপযুক্ত মুক্তা—রাজমুকুটেই স্থান পাইবে।

কুমার—যন্ত্রণায় অধীর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

আবার কুমার স্বপ্ন দেখিল—শত শত তন্তুবায় কারিকর রাতের অন্ধকারে আলো জ্বালিয়া নিবিষ্ট মনে কাজ করিতেছে, পরণে তাহাদের শতছিন্ন ধুতি, মুখখানি মলিন,—তাহারা সারারাতই এমনি ভাবে একটানা খাটিয়া চলিয়াছে। সর্দ্দার কারিকর অনবরত তাহাদের তাড়া দিতেছে—যাহা কিছু কাজ আজ রাত্রেই শেষ করিতে হইবে—যেমন করিয়াই হউক। বেচারারা চোখের জলে নিজেদের প্রস্তুত পোষাক সিক্ত করিয়া ফেলিয়াছে—কুমার যাইয়া সর্দ্দারকে বলিল, "বেচারারা সমস্ত রাত্রি ঘুমায় নাই, ইহাদের চোখের জলে যে পোষাক ভিজিয়া গেল—কাহার অঙ্গে এই পোষাক উঠিবে?"

"জান না! আমাদের কুমার যে এই পোষাক পরিয়াই—সিংহাসনে বসিবেন!"

কুমারের মুখে আর বাক্য সরিল না। সেই ত হুকুম করিয়াছিল, কাল দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর অঙ্কিত

রেখাচিত্র হইতে সেরা মুক্তা, মণি, হীরক খচিত পোষাক তাহার জন্য এক রাতের মধ্যে তৈরী করা চাই। কুমার আর সহিতে পারিল না, কষ্টে দুঃখে সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। আজ কুমার সিংহাসনে বসিবেন। তাই সারা রাজ-পরিবার উৎসবে মাতিয়াছে। মন্ত্রী পরিবারবর্গ—রাজ দরবারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন—পুরোহিত মঙ্গল ঘট পাতিয়াছেন—মহিলারা অন্তঃপুরে আজ ভারী ব্যস্ত।

কুমার তাহার বসিবার কক্ষে একা বিষণ্ণমুখে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সেখানে আসিলেন বৃদ্ধ রাজমন্ত্রী। সঙ্গে এক অনুচারিকার হস্তে রাজপোষাক। মন্ত্রী পোষাকটি কুমারকে দেখাইয়া বলিলেন ;—

"কুমার! বহু পরিশ্রমে এই পোষাকটি আপনার জন্য তৈরী করিয়াছি। রাজ্যের যারা শ্রেষ্ঠ কারিকর, তারা সারা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া এই পোষাকটি খাড়া করিয়াছে। আমি মণি মাণিক্য হীরক সাগর সেঁচিয়া পৃথিবী চষিয়া ঐ পোষাকে পরাইবার জন্য আনিয়াছি। আপনি পছন্দ করিলেই—আমাদের সব চেষ্টা সার্থক হয়।

সেই স্বপ্ন-দর্শিত পোষাক, মণি-মাণিক্য!

কুমারের আর মুখে কথা বলিবার শক্তি ছিল না, অতি কষ্টে বলিল, "আমি ও পোষাক পরিব না"

মন্ত্রী ত ভয়ে বিস্ময়ে অস্থির, ভয়ের চিহ্ন তাহার নাকে চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কুমার তাহাকে অভয় দিয়া বলিল, "পোষাক খুবই ভাল হইয়াছে, আপনার দিকে কোন ত্রুটীই হয় নাই। তথাপি আমি এই পোষাক পরিব না। কত লোকের অশ্রু দিয়া যে এই পোষাক তৈরী হইয়াছে তাহা যদি আপনি জানিতেন, তবে আর আপনি এরূপ অনুরোধ করিতে পারিতেন না।"

তখন কুমার তাহার স্বপ্নের কথা মন্ত্রীকে বলিল। মন্ত্রী ভাবিল কুমার কি পাগল হইয়াছে? মুখে বলিল ;—

"মহারাজ,—দুর্ব্বল মস্তিষ্কের চিন্তাফল স্বপ্ন—স্বপ্নের উপর কোন আস্থা করিবেন না—এ সকল ক্ষণিক দৌর্ব্বল্য ঝাড়িয়া মুছিয়া ফেলুন। আপনি রাজা, রাজ পরিচ্ছদ না পরিলে লোকে আপনাকে চিনিবে কি করিয়া?"

"রাজ পোষাক না পরিলে লোকে আমাকে চিনিতে পারিবে না!"

"না কুমার!"

আমার ধারণা ছিল পোষাক ভিন্ন রাজার মধ্যে অন্য আরও এমন কিছু থাকে যাহার জন্য রাজা রাজা, প্রজা প্রজা—কিন্তু সে আমার ভুল ধারণা দেখিতেছি। এ রাজ্য—এ রাজ পরিচ্ছদে আমার কাজ নাই।"

তাহার পর সকলকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া রাজকুমার নিজের রাজবেশ খুলিয়া আবার সেই রাখাল বেশ পড়িল—যেমনটি সে এতদিন বনে পরিয়া আসিয়াছে। সেই বেশেই কুমার রাজপ্রাসাদের ভিতর

দিয়া রাস্তায় যাইতেছিল। তাহার পারিষদেরা কুমারের এই কার্য্য দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক! কেহ বা বলিতেছিল, কুমার বাতিকগ্রস্ত ; কেহ বা বলিতেছিল, ক্ষণিক উম্মত্ততা, কবিরাজ দেখাইয়া চিকিৎসা করা হউক ; কেহ বা বলিতেছিল, এই—অভাগাই রাজবংশে কালি দিবে—ইহাকে এখনই রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়া উচিত।

কুমার এই সব শ্লেষ শুনিয়াও তাহাদের দিকে তাকাইল না—সোজা রাস্তায় চলিল। কিন্তু সেখানেও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের অন্ত ছিল না। প্রজারাও কুমারকে ভিখারী বেশে দেখিয়া ক্ষুন্ন হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে মাতব্বর যিনি তিনি কুমারের নিকট আসিয়া বলিলেন,

"কুমার, একি আপনার ব্যবহার—আপনি যে রাজা সে কথা কেন ভুলিয়া যান?"

কুমার বিষন্নমুখে তাহার স্বপ্নের কথা সবাইকে বলিল।

মাতব্বর সব শুনিয়া বলিল,—"ও সব চিন্তা মন হইতে দূর করিয়া দিন। আমাদের জন্য ভাবিবেন না। আপনি কি জানেন না ধনীর ঐশ্বর্য্যদ্বারাই দরিদ্রের চলে। আপনাদের জাঁকজমক দেখিয়াই আমাদের নয়নের তৃপ্তি, আপনাদের বাজে খরচের টাকা আমাদেরই হাতে আসে -

"বদ রাজা খারাপ সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন অভিভাবক না থাকা আরও খারাপ। পৃথিবীর যাহা নিয়ম তাহা মানিয়া চলিতে হইবে। আপনার ইচ্ছামত সব চলিতে পারে না। আপনি কি জিনিষের দর বাঁধিয়া দিয়া খরিদদারকে বলিয়া দিবেন এত মুল্যে জিনিস কিনিবে, আর বিক্রেতাকে বলিবেন এত মুল্যে জিনিস বেচিবে? তা হয় না কুমার—যান প্রাসাদে ফিরিয়া—রাজ পরিচ্ছদ পরিয়া রাজকার্য্য করুন।"

এ উপদেশ বাক্যে কুমারের মন প্রবোধ মানিল না—কুমার কোন কথার উত্তর না দিয়া সেই বিরাট জনসঙ্ঘ ভেদ করিয়া কালীমন্দিরের দিকে ছুটিলেন।

যখন সাধারণ লোক তাহার মনে শান্তি দিতে পারিল না তখন কালীমাতার উপাসক রাজ পুরোহিত ধর্ম্ম গুরু বুঝি বা তাহার ঈপ্সিত মনের শান্তি দিতে পারিবে, তাই বড় আশা করিয়া কুমার পুরোহিতের নিকট ছুটিয়া চলিল।

পুরোহিত ছিলেন পূজায়—কুমারকে রাখাল-বেশে দেখিয়া তিনি একেবারে অবাক! কুমার তাহার স্বপ্নের কথা সব খুলিয়া বলিয়া তাহার নিকট উপদেশ চাহিল।

পুরোহিত উত্তর করিলেন, "আমরা জগতের ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া অতি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি আমি জানি পাপ কাজ পৃথিবীতে অনেক হয়। দস্যু অনেক হয়। দস্যু আসিয়া নিরপরাধ গৃহস্থের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। হিংস্র জন্তু আসিয়া শিশুসন্তান বধ করে, দরিদ্র যে সে ধনীর পরিত্যক্ত আহার্য্য কুকুরের সঙ্গে রাস্তায় বসিয়া খায়—ইহাই জগতের নিয়ম। ইহার অন্যথা কি আপনি করিতে পারেন? সে ক্ষমতা আপনার নাই। যাহার আদেশে এই সব হইয়াছে—যিনি সৃষ্টি করিয়া দেন তিনি আপনা অপেক্ষা ঢের বেশী জ্ঞানী। আপনার একার এ ক্ষমতা নাই যে সব দুঃখ দারিদ্র্য পৃথিবী হইতে দূর করিয়াদেন সুতরাং ও সব কথা আর ভাবিবেন না—যান ফিরিয়া রাজপ্রাসাদে—যাইয়া রাজকার্য্য করুন।

কুমার বলিল, "আমি ও পোষাক পরিব না।"

বৃদ্ধ পুরোহিতের এই কথা শুনিয়া কুমারের শেষ আশাও ফুরাইল। তাহার মনের সন্দেহ দূর হইল না। বড় আশা করিয়া সে আসিয়াছিল—সব তাহার বিফল হইয়া গেল। অতি দুঃখে হৃদয়ের জ্বালা রাখিবার স্থান না পাইয়া কুমার কালীমাতার কাছে নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিল।

"দেবী, আমার মনে জোর দিন—আমি যে ভাল মন্দ, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—এ কি পরীক্ষার মধ্যে আমায় ফেলিলে ?"

কুমারের ঐকান্তিক প্রার্থনায় দেবীর আসন বুঝি বা টলিয়াছিল। কুমারের মুখে চোখে নাকে এক দিব্য জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল।

উন্মত্ত নাগরিকেরা দূর হইতে দৌড়িয়া আসিতেছিল—এই রাজবংশের কলঙ্ককারী কুমারকে তাহারা আজ হত্যা করিবে। ছুটিয়া ছুটিয়া তাহারা কালীমাতার মন্দিরে কুমারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে দেখে সেই অপূর্ব দৃশ্য। কোথায় লাগে তাহার নিকট রাজ পরিচ্ছদ — রাজ মুকুট। যে দিব্য জ্যোতি তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বাহির হইতেছিল তাহাতে শত পরিচ্ছদ শত মুকুট—ভাসিয়া যায়।

প্রজাবৃন্দ কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল ভুলিয়া গেল—তাহারা নত জানু হইয়া কুমারকে প্রণাম করিল।

কুমার তাহাদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া বলিল ;—

"আশীর্ব্বাদ কর ভাই সব, যেন এইভাবে বিনা পরিচ্ছদেই আমি রাজগৌরব লইয়া দিন কাটাইতে পারি।"

চিন্তা, মন ও স্মৃতির কথা

(শ্রীঅপূর্ব ঘোষ)

আমাদের ধারণা যে মনটা বুঝি ঠিক সাদা কাগজের মত। কাগজের উপর যেমন কালীর আঁচড় টানিয়া আমরা দাগ কাটি, আমাদের চিন্তারাশিও বুঝি মনের উপর ঠিক তেমনিভাবে কতকগুলি ছাপ রাখিয়া যায়। কিন্তু এটা অত্যন্ত ভুল ধারণা। কাগজ নিষ্ক্রিয়, নিজে কিছু করিবার ক্ষমতা তাহার আদৌ নাই ; কিন্তু মন একেবারে নিষ্ক্রিয় নয়- সে রীতিমত ক্রিয়াশীল। মনে কর একব্যক্তি হার্ম্মোনিয়ম বাজাইয়া খুব সুন্দর একটী গান করিতেছে—আমি বসিয়া বসিয়া তাহাই শুনিতেছি। তখন আমার মনের অবস্থা কি রকম হয় তাহা কি বলিতে পার ? মন তখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। ঐ ব্যক্তির মন এবং হাত যে ভাবে চলিতেছে, আমার মনও ঠিক তেমনিভাবে কাজ করিয়া চলিয়াছে। আরো দুইটা

উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। মনে কর তুমি দৌড়াইতেছ কিম্বা সাঁতার কাটিতেছ। তুমি যখন দৌড়াও—তোমার পা দুটা কেবলি ছুটিতে থাকে—সেই সময় তোমার মনও কি তোমার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে থাকে না ? মনের কি সাধ্য আছে যে তখন ইতিহাস কিম্বা ভূগোলের পড়া মুখস্থ করে ? তেমান সাঁতার কাটিবার সময় তোমার মনও তোমার সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার কাটিতে থাকে—তোমাকে জলে রাখিয়া তোমার মন ডাঙ্গায় বসিয়া বুঁদে মিহিদানা খাইতে পারে না।

আমাদের চিন্তা করিবার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ভাব আসিয়া মনের মধ্যে উপস্থিত হয়—ইংরেজীতে ইহাকে বলে—Association of ideas. কিছু দেখা, স্পর্শ, কিম্বা আস্বাদন করা, শব্দ শোনা অথবা কিছু অনুভব করা—সকল কিছুতেই আমাদের মনে একটা-না-একটা ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়ই। এই যে আকাশে আলো দেখিলেই সূর্য্যের কথা মনে পড়ে, কুহু কুহু শুনিলেই কোকিলের কালো চেহারাটী মনে পড়িয়া যায় এসব আর কিছু নয়—এগুলিতে আমাদের স্মৃতিশক্তিরই পরিচয় দিয়া থাকে। কোন একটা জামা কিম্বা আংটী দেখিলে একদিন যে সেগুলি ব্যবহার করিত অথচ আজ পৃথিবীতে সে নাই—তার কথা কেন মনে জাগিয়া উঠে ? একটী ফ্রক দেখিলে কেন একটী ছোট্ট মেয়ের চেহারাই মনে পড়িয়া যায় ? আমরা যাহা কিছু দেখি এবং দেখিতে দেখিতে অভ্যস্থ হইয়া যাই, সেই সব কিছুরই একটা করিয়া ছাপ আমাদের মনের উপর থাকিয়া যায় এবং যখন কোন কারণে তাহার একটা জিনিষ আমাদের চোখের সমুখে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন স্মৃতির কোঠায় আঘাত পড়ে এবং অতীতের বহু পুরাতন কথা ও ঘটনা মনের ভিতর জাগিয়া উঠে।

কোন কিছু শিক্ষা করিতে হইলেই সকলের আগে দরকার স্মৃতিশক্তি। স্মৃতিশক্তি যাব নাই সে কখনো কিছু শিখিতে পারে না। শুধু যে মানুষেরই এই শক্তি আছে তাহা নয় পশু প্রভৃতি ইতর প্রাণীরও এই শক্তি রহিয়াছে মাঝে মাঝে আমরা তাহার প্রমাণও পাইয়া থাকি। যুদ্ধের ঘোড়াগুলি যখন অনেকদিন ধরিয়া কেবল খায় আর ঘুমায়—যুদ্ধ না বাঁধিলে তাহাদের ঐ দুটী কাজ ছাড়া ত আর অন্য কোন কাজই থাকে না—সেই অবস্থায় যদি হঠাৎ একদিন রণবাদ্য বাজিয়া উঠে তখন ঐ ঘোড়াগুলি সেই শব্দ শুনিয়া একেবারে পাগল হইয়া উঠে—যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছুটিয়া যাইবার জন্য একেবারে চঞ্চল হইয়া যায়। পূর্ব্বে যুদ্ধে গিয়াছিল এবং ঐ রকম শব্দ শুনিয়াছিল বলিয়াই এই ঘোড়াগুলির স্মৃতিতে তাহা বাঁধা পড়িয়া রহিয়াছিল—আজ পুনরায় তাহা জাগিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই তাহাদের এরকম চঞ্চলতা প্রকাশ পাইতেছে।

মন থাকিলেই সে চিন্তা করিবে এবং চিন্তা যে যত বেশী গভীর ভাবে করিতে পারিবে তার স্মৃতিশক্তিও তত প্রবল হইবে। মানুষের মত এমন সূক্ষ্ম মন আর কোন প্রাণীর নাই—তাই মানুষ পৃথিবীর অন্য সকল রকম প্রাণীর উপর আধিপত্য করিতে পারিতেছে।

বাংলাভাষার—রত্ন-খনি

[এই মাস থেকে "বাঙ্গালা ভাষার রত্নখনি" নাম দিয়ে একপাতা করে লেখা প্রতি মাসের "আমার দেশে" বেরুবে। এর উদ্দেশ্য বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তোমাদের বয়স অল্প;—এ সব জিনিষ আপনি আপনি বেছে বার করবার মত বিদ্যা তোমাদের হয়ত এখনও হয় নি;—তবে এগুলি পড়্‌লে তোমরা বুঝ্‌তে পারবে যে কি অমূল্য রত্ন সব বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে ছড়ান আছে,—বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তোমাদের একটা আন্তরিক টান হবে। এই চমৎকার লেখাগুলির প্রত্যেকটী ছত্র, প্রত্যেকটী কথা তোমাদের সকলেরই মুখস্থ ক'রে রাখা উচিৎ।]

দারিদ্র্য, পৌরোহিত্য ও মদান্ধের অত্যাচারে জর্জ্জরিত, ভারতের লক্ষকোটী পদদলিত নরনারীর কল্যাণ-কামনায়, এসো আমরা প্রার্থনা করি। নৈয়ায়িক নহি, দার্শনিক নহি, এমন কি তপস্বী নহি। আমি দরিদ্র, তাই দরিদ্রদিগকে ভালবাসি। ত্রিশকোটী দারিদ্র্য ও অজ্ঞতায় নিমজ্জিত নরনারীর কথা এদেশে কেউ ভাবে? কে তাহাদের নিকট জ্ঞানালোক লইয়া যাইবে, কে তাহাদিগের দ্বারে দ্বারে গিয়া শিক্ষা দিবে? এই জনসঙ্ঘ তোমার ঈশ্বর হউক,—তাহাদের কথা ভাব, তাহাদের জন্য কার্য্য কর,—ভগবান তোমাকে পথ দেখাইবেন। দরিদ্রের দুঃখে যাঁহার চিত্ত বিগলিত হয়, তিনিই মহাত্মা, অপরে দুরাত্মা।

—স্বামী বিবেকানন্দ

ঠাকুর নামদেব

(২)

যৌবন-কথা

(রায় বাহাদুর শ্রীজলধর সেন)

আগের বারে নামদেব ঠাকুরের কৈশোর-কথা তোমাদের বলেছি ; এবার তাঁর যৌবন-কথা বল্‌ব। নামদেবের যৌবন-কথা আরও সুন্দর, আরও পবিত্র।

নামদেব যৌবনে পদার্পণ করলেন। বাল্যকালে ভগবানের উপর তাঁর যে ভক্তি ও নিষ্ঠা ছিল, ক্রমে তা বেড়ে যেতে লাগ্‌ল। লোকে যেমন ছেলে বয়সে নানা রকম খেলা ধূলা করে, আমোদ আহ্লাদ করে, নামদেব ঠাকুর তা করতেন না। তিনি ভগবানকে আরও নিকটে পাবার জন্যে দিনরাত আকুল হ'য়ে ডাকতেন। ভক্তের কাতর প্রার্থনায় ভক্তবৎসল ভগবান কি চুপ ক'রে থাক্‌তে পারেন—তিনি ভক্তকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

নামদেবের দাদা মহাশয় বামদেব ঠাকুর গৃহ দেবতা মাধবের পূজায় দিনপাত করতেন ; নামদেবও সব ছেড়ে দিয়ে দাদামহাশয়ের পূজায় সাহায্য করতেন। নামদেব বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর আদরের নাতিটী বড় সামান্য ছেলে নয়। তাই তিনি খুব যত্ন করে নামদেবকে ভগবানের সেবায় দীক্ষিত করতে লাগ্‌লেন। যৌবনে পদার্পণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের চারিদিকে ভক্ত ব'লে নামদেবের খ্যাতি রটে গেল। গ্রামের লোকেরা জান্‌ত—নামদেব ভগবানের কৃপায় অসীম অনুগ্রহ লাভ করেছেন ; নচেৎ এই তরুণ বয়সে যখন সাধারণ ছেলেরা খেলাধূলায় মত্ত থাকে, নামদেব তখন ভগবানের গুণকীর্ত্তন করতেন। আর বল্‌তেন—"ভগবান, তোমার কৃপা থেকে যেন বঞ্চিত না হই। যদি কখনও মোহের বশে পথ ভুলে বিপথে গিয়ে পড়ি, তখন তুমি আমার হাত ধ'রে ফিরিয়ে নিয়ে এসো।"

এ সব কথা কখনও গোপন থাকে না। গ্রামের লোকের মুখ থেকে নামদেবের কথা তখন সহরের লোকদের মুখে মুখে ফিরতে লাগ্‌ল। সবাই জান্‌তে পারল—নামদেব সামান্য লোক নন। তাঁকে দেখে ধন্য হবার জন্য নানা দূর দেশ থেকে দলে দলে লোক তাঁর কাছে আস্‌তে লাগ্‌ল, আর তাঁর মুখে ভগবানের নাম-কীর্ত্তন শুনে পবিত্র হ'য়ে যেতে লাগ্‌ল।

নামদেবের ভক্তি ও নিষ্ঠার কথা ক্রমে দেশের রাজা বাদ্‌শাদের কাণে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সভাসদ্‌দের মুখে অবিরত নামদেবের কথা শুনে বাদ্‌শার নামদেবকে দেখ্‌বার খুব ইচ্ছা হ'ল। তিনি নামদেবকে নিয়ে আস্‌বার জন্য লোক পাঠিয়ে দিলেন।

হঠাৎ বাদ্‌শার হুকুম পেয়ে নামদেব যেন কেমন হ'য়ে গেলেন। তিনি একটু ভীত হ'লেন। ভাব্‌লেন—"আমি ত জ্ঞান হ'য়ে অবধি কারো কিছু অন্যায় বা ক্ষতি করি নি। আমি মাধবের পূজো করি, আর অবসর মত ভগবানের নাম করি। আমায় বাদ্‌শা কেন তলব দিয়েছেন—তা ত আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

নামদেব অনেকক্ষণ একাগ্রমনে ভগবানের গুণকীর্ত্তন করলেন। ভগবানের নাম ক'রে তাঁর মনে একটু শান্তি এল। তিনি বাদ্‌শার সভায় গিয়ে উপস্থিত হ'লেন।

নামদেবকে দেখেই বাদ্‌শা বল্লেন—"তোমার কথা আমি অনেক লোকের মুখে শুনেছি। তুমি নাকি কি এক দিব্য শক্তির অধিকারী হ'য়েছ, যার বলে তুমি আশ্চর্য্য কৌশল দেখাতে পার। নানা রমক কৌশল দেখবার জন্যে আমি তোমায় ডেকে আনিয়েছি।"

বাদ্‌শার কথা শুনে নামদেব চুপ করে রইলেন। তিনি বিষম বিপদে পড়্‌লেন। তারপর বল্লেন—"হুজুর, আমি ত কোন কৌশল জানি না। আমি গরীব ব্রাহ্মণ—ভগবানের পূজা-অর্চ্চনা করি, আমি ত কোন কৌশলই দেখাতে পারি না, হুজুর।"

নামদেবের এই কথা শুনে বাদ্‌শা রেগে জ্বলে উঠ্‌লেন; তিনি তখনই নামদেবকে কয়েদ ক'রে রাখ্‌বার হুকুম দিলেন। নামদেব কারাগারে বন্দী হ'য়ে রইলেন।

এই ভাবে দু'চার দিন চলে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন বাদ্‌শা আবার নামদেবের কাছে এসে বল্লেন—"নামদেব, এখনও স্বীকার কর—তোমার কৌশল দেখাও।"

নামদেব পূর্ব্বের মত ধীর ভাবে জবাব দিলেন—"হুজুর, আমি কোন কৌশলই দেখাতে জানি না। আমায় বিশ্বাস করুন।"

বাদ্‌শা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ কিছু দূরে তাঁর চোখে পড়ল তিনি দেখ্‌লেন, একটা বাছুর মরে পড়ে আছে, আর তারই কাছে দাঁড়িয়ে একটা গাভী আকুল হ'য়ে চীৎকার করছে।

বাদ্‌শার কি মনে হ'ল, তিনি নামদেবকে পরীক্ষা করবার জন্য তাঁকে বল্লেন—"ঠাকুর, তোমাদের

শাস্ত্রে গরুকে নাকি পূজা করতে উপদেশ দেয়। শুনেছি তুমি খুব ভক্ত—ভক্ত হ'য়ে তুমি এ শোচনীয় দৃশ্য দেখ্‌ছ। বাছুরটাকে যদি বাঁচাতে পার—তবেই বলি তুমি ভক্ত।"

গাভীর কাতর রোদন শুনে নামদেবের হৃদয়ে খুব আঘাত লেগেছিল। কিন্তু তখন গাভীটা তার বাছুরের মুখের দিকে চেয়ে আরও ব্যাকুলভাবে চীৎকার করতে লাগ্‌ল। তখন নামদেব ঠাকুর আর স্থির থাক্‌তে পারলেন না। তিনি বাছুরটীর কাছে সরে গিয়ে তুড়ি দিয়ে তাকে বল্লেন—"বাছা, তোমার মা যে কেঁদে কেঁদে সারা হ'য়ে গেল, তবুও তুমি উঠ্‌ছ না। ওঠ-ওঠ, আর দেরী করো না। দেখ্‌ছ না তোমার মা কত কাঁদ্‌ছেন।"

তারপর যা ঘটল তা দেখে বাদ্‌শার মুখে আর কথা সরল না, তিনি অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলেন; আর সেখানে যারা মজা দেখ্‌বার জন্য উপস্থিত হ'য়েছিল, তারা সকলেই বিস্মিত হ'য়ে এ ওর মুখের দিকে চাইতে লাগ্‌ল। তারা দেখ্‌ল—মরা বাছুর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর দুধপান করতে লাগ্‌ল!

নামদেবের এই আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখে বাদ্‌শা খুব সন্তুষ্ট হ'লেন। তিনি তখনই হুকুম দিলেন, নামদেবকে বিস্তর জমি জমা ও ধন দৌলত দেওয়া হোক্‌।

নামদেব সে কথা শুনে হাত যোড় ক'রে বাদ্‌শাকে বল্লেন—"হুজুর, আমি সামান্য ব্রাহ্মণ, মাধবের পূজা-অর্চ্চনায় আমাদের দিন কেটে যায়, ধন-দৌলতের ত আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।"

নামদেবের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই হঠাৎ চারদিকে একটা সাড়া প'ড়ে গেল; বাদ্‌শা অবাক হয়ে দেখ্‌লেন—তাঁকে খুসী করবার জন্যে রাজ্যের এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক অনেক দূর থেকে বহুমূল্য পালঙ্ক ও বিছানাপত্র নিয়ে এসেছেন। বাদ্‌শা তাই দেখে সেই সব বহুমূল্য জিনিষগুলি গ্রহণ করবার জন্য নামদেবকে বিস্তর অনুরোধ করতে লাগ্‌লেন।

বাদ্‌শার এই কাতর মিনতি দেখে নামদেব সেই বহুমূল্য পালঙ্ক ও বিছানাপত্র প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না।

বাদ্‌শা তখন খুসী হ'য়ে লোকজন ডেকে আদেশ দিলেন, তারা যেন এই সব দ্রব্যজাত মাথায় ক'রে নামদেব ঠাকুরের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসে।

নামদেব হাত যোড় করে বল্লেন—"লোকজন দিয়ে কি হবে—"মুঞি মাথে করিয়া লইয়া যাব বাসে।" বলে তিনি সমস্ত জিনিষ নিজে মাথায় করে নিয়ে চল্লেন।

নামদেবের এই অদ্ভুত আচরণ দেখে বাদ্‌শার মনে যেন একটা সন্দেহ হ'ল। তিনি তখনই একজন চরকে ডেকে বলে দিলেন, সে যেন নামদেবের অজ্ঞাতসারে তাঁর পিছন পিছন গিয়ে দেখে আসে—নামদেব কি করেন বা কোথায় যান।

নামদেব ঠাকুর সেই একরাশ জিনিষ মাথায় ক'রে নদীর ঘাটে এলেন। তারপর

সেই সব বহুমূল্য খাট-বিছানা টান মেরে নদীর জলে ফেলে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাড়ীর পথে যাত্রা করলেন।

বাদ্‌শার চর সমস্তই লক্ষ্য করল। সে তখনই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে বাদ্‌শাকে সব কথা খুলে বল্‌ল। বাদ্‌শা তখনই আবার লোক দিয়ে নামদেব ঠাকুরকে ডেকে পাঠালেন।

নামদেব উপস্থিত হ'লে বাদ্‌শা তাঁকে জিজ্ঞাসা কল্লেন—"ঠাকুর, আমি তোমায় যে সব দামী জিনিষ-পত্র দিয়াছি, তুমি তা নদীর জলে কেন ফেলে দিলে?"

নামদেব বল্লেন—"হুজুর, ও সব জিনিষে ত আমার কোন দরকার নেই। যদি সেই সব জিনিষ জলে ভিজে নষ্ট হ'য়ে গেছে বলে আপনার কষ্ট হয়, তবে আসুন, আমি তা সব উদ্ধার করে দিচ্ছি।"

নামদেবের এই কথা শুনে বাদ্‌শা আবার কৌতুক করে তাঁর সঙ্গে লোকজন পাঠিয়ে দিলেন। তারপর নামদেব ঠাকুর যা করলেন, তা আরো আশ্চর্য্য। তিনি—

"সেই খাট শুষ্ক শয্যা সেই আবরণ।
জলে হৈতে তুলি দিয়া করিলা গমন॥"

নামদেবের এই আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখে বাদ্‌শার লোকজন অবাক্ হ'য়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল—কারো মুখে আর কথা ফুট্‌ল না। (ক্রমশঃ)

মধুসূদন

(শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত)

তোমরা নিশ্চয়ই কবি মধুসূদনের নাম শুনিয়াছ। একশো বছর আগে তিনি আমাদের বাঙ্গালা দেশের যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেদিন তাঁহার শত বার্ষিক জন্মোৎসব হইয়া গেল! বাঙ্গলার প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই সেই জন্মোৎসব সভায় মিলিত হইয়া বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবির প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলেন।

মধুসূদন যে যুগে জন্মিয়াছিলেন, সে যুগে সবেমাত্র ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার নূতন ঢেউ আসিয়া পোঁছিয়াছিল, সেই নূতন স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া অনেকেই দেশের প্রাচীন আদর্শ ভুলিয়া যাইয়া, ইংরেজী আদব কায়দা, চাল চলন, কথা বার্ত্তা, আহার বিহার নকল করিতেন এমন কি অনেকে ইংরেজীতে বুঝি বা স্বপ্নও দেখিতেন! মধুসূদন ঐ যুগে জন্মিয়াছিলেন কাজেই তাঁহার উপর ইংরেজী প্রভাবটা অতি বেশী রকমেরই আসিয়া পড়িয়াছিল। তিনি ছাত্রাবস্থায়ই খৃষ্টান হইলেন—এবং জাতি ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজ সমাজে মিশিলেন। খৃষ্টান হইয়া তাঁহার নাম হইল মাইকেল মধুসূদন!

সেকালে হিন্দু স্কুল ছিল—দেশের একমাত্র শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়। দেশের যত বড় ঘরের ছেলেরা এ বিদ্যালয়েই শিক্ষা লাভ করিতেন। মধুসূদনও এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন,—তোমরা অনেকেই হয়ত ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির নাম শুনিয়াছ, ইঁহারা হিন্দুস্কুলে মধুসূদনের সহপাঠি ছিলেন। মধুসূদন—লেখাপড়ায় খুবই ভাল ছিলেন, সাহিত্যে ছিল তাঁহার—অসাধারণ প্রতিভা। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি ইংরেজীতে কবিতা লিখিতেন; ইংরেজ, গ্রীক্ ও অন্যান্য দেশের বড় বড় কবিদের কবিতা পড়িতেন! অঙ্কের দিকে তাঁর কোন মনোযোগই ছিল না, কিন্তু এক দিন তিনি—অঙ্কের দিক্ দিয়াও এমন অসাধারণ প্রতিভা দেখাইলেন যে সকলে বিস্মিত হইল এবং ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিল না। সে কি হইয়াছিল জান? একদিন—ভূদেব ও মধুসূদনে তর্ক বাধিল। সেক্সপীয়র বড় কি নিউটন বড়? ভূদেব বলিলেন, নিউটন বড়, কেননা ভূদেব ছিলেন অঙ্কশাস্ত্রে অনুরাগী; মধুসূদন বলিলেন সেক্সপীয়র বড়, সেক্সপীয়র ইচ্ছা করিলে নিউটন হইতে পারিতেন, কিন্তু নিউটন ইচ্ছা করিলেই সেক্সপীয়র হইতে পারিতেন না।' সেদিন সেখানেই তর্ক শেষ হইয়া গেল!

একদিন অঙ্কের শিক্ষক ক্লাসে একটী শক্ত আঁক দিলেন, কেহই সেটি কষিতে পারিল না, কিন্তু মধুসূদন দেখিতে দেখিতে তাহা কষিয়া দিলেন, শিক্ষক ও ছাত্র সকলেই অবাক্! মধুসূদন কিনা আজ তাহাদিগকে হারাইয়া দিল! মধুসূদন তখন ভূদেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন "কেমন ভূদেব, দেখিলেত, সেক্সপীয়র ইচ্ছা করিলে নিউটন হইতে পারিতেন, কিন্তু নিউটনের কি সাধ্য যে সেক্সপীয়র হইতে পারেন?" ভূদেব আর কথা বলিতে পারিলেন না।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

মধুসূদনের জীবন বৈচিত্র্যময়, সে সব কথা দু'চারি কথায় ত আর বলা চলে না। বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করিয়া—তিনি কিছুদিন মান্দ্রাজ গিয়া সেখানে একখানা ইংরেজী কাগজের সম্পাদকও হইয়াছিলেন, তারপর অনেক দিন ইউরোপের নানাদেশে ঘুরিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহাকে অনেক কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল, সে দুঃখের কথা পড়িলে তোমাদেরও চোখে জল আসিবে! সে বিপদের সময়ে একমাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

কিন্তুএজন্যই ত মধুসূদনের এত বড় নাম নয়! তাঁর নাম কেন জান? অত বড় বাঙ্গলা কবি আজও আমাদের দেশে জন্মে নাই, এক দিকে তিনি অতুলনীয়।—তোমরা যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতা পড়, এই ছন্দ মধুসূদনের সৃষ্টি! মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনেক কাব্যই লিখিয়া গিয়াছেন,—সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাব্য হইতেছে "মেঘনাদবধ কাব্য।" যেমন ইহার পদ লালিত্য—তেমনি গুরুগম্ভীর ভাষা।

মধুসূদন পূর্ব্বে ইংরেজী কবিতা লিখিতেন, পরে তাঁহার মনে হইল—

"স্বপ্নে মোরে কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে
মাতৃ কোষে রতনের রাজি
এ ভিখারীর দশা তোর কেন তবে আজি ?"

মধুসূদন যে সকল ইংরেজী কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা সকলে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু মধু-সূদনের বাঙ্গালা কাব্যগুলিত কেহ ভোলে নাই, ভুলিবেও না।

মধুসূদন দেশকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। তোমরা—মেঘনাদ বধ কাব্যে দেখিতে পাইবে বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণ শোক করিয়া বলিতেছেন—

"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার, প্রিয়তম,
বীরকুল সাধ এ শয়নে সদা, রিপুদলবলে
দলিয়া সমরে, জন্মভূমি রক্ষা হেতু
কে ডরে মরিতে! যে ডরে ভীরু সে মূঢ়।"

বাঙ্গলা দেশ তাঁহার জন্মভূমি। বেশভূষায় সাহেব হইলেও মনটা ছিল তাঁর খাঁটি বাঙ্গালীর। ইউরোপ যাত্রার সময় তাই তিনি বঙ্গভূমিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"রেখ মা দাসেরে মনে
এ মিনতি করি পদে,
সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন করো নাকো তব মনঃ কোকনদে!"

বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা প্রথম নাটকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মধুসূদন ছিলেন তাঁহাদেরই একজন। 'কৃষ্ণকুমারী, শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি অনেক নাটকও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। একদিন মধুসূদন লিখিয়াছিলেন—

"সেই ধন্য নরকুলে
লোকে যাঁরে নাহি ভোলে
মনের মন্দিরে নিত্য পূজে সর্ব্বজন!"

মধুসূদন তাঁহাদেরই একজন। প্রাতঃস্মরণীয় অমর কবি।

সম্পাদকের চিঠি

আমার দেশের ছোট ভাই বোনগুলি !

মাঘ মাসের "আমার দেশ" দেখে তোমরা যে খুব খুস হয়েছ, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি। ফাল্‌গুণ মাসের "আমার দেশ" দেখেও যে তোমরা খুব খুসী হবে, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। এবার থেকে "আমার দেশ"কে সত্যিই এমনভাবে সাজান হবে যে, যে দেখ্‌বে সেই স্বীকার কর্ব্বে ছেলেমেয়েদের এত সুন্দর মাসিক পত্র আর একটীও নেই।

এই মাসের ধাঁধাঁর উত্তর তোমরা সবাই পাঠিয়ো ;—কেন না তাতে একটা প্রাইজ আছে। কি জানি তোমার কপালেও হয়তো জুটে যেতে পারে !

এই মাস থেকে "বাঙ্গালা ভাষার রত্নখনি" নাম দিয়ে একপাতা করে লেখা প্রতিমাসের "আমার দেশে" বেরুবে। এর উদ্দেশ্য বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তোমাদের বয়স অল্প ;—এসব জিনিষ আপনি আপনি বেছে বার করবার মত বিদ্যা তোমাদের হয়ত এখনও হয় নি ;—তবে এগুলি পড়্‌লে তোমরা বুঝ্‌তে পারবে যে কি অমূল্য রত্ন সব বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে ছড়ান আছে, বাঙ্গালা ভাষার প্র তোমাদের একটা আন্তরিক টান হবে। এই চমৎকার লেখাগুলির প্রত্যেকটী ছত্র, প্রত্যেকটী কথা তোমাদের সকলেরই মুখস্থ ক'রে রাখা উচিৎ।

ভক্তমাল নামে একখানি চমৎকার বই আছে। এই বইতে ভগবানের ভক্তদের নানারকম চমৎকার গল্প আছে। এই বই থেকে তোমাদের মতন করে লিখে, রায় বাহাদুর শ্রীজলধর সেন, মাঘ মাসে এবং এই মাসে দুইটি সুন্দর গল্প "আমার দেশের" মারফতে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন। এরকম গল্প তিনি তোমাদের আরও উপহার দেবেন। এগুলি পড়ে' একদিকে যেমন তোমাদের ভগবানে ভক্তি বাড়্‌বে, অন্যদিকে তেমনি আমোদও তোমরা পাবে।

তোমরা বিজ্ঞানের অদ্ভুত অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপের গল্প শুন্‌তে ভারি ভালবাস। এতে তোমাদের আমোদও যেমন হয়, তেমনি শিক্ষাও হয়। আমাদের দেশে এখন বিজ্ঞানের শিক্ষা ভারি দরকার। সেই জন্য তোমাদের প্রিয় লেখক শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ বি, এস্‌ সি, মাঘ মাসে ও এই মাসে দুটি বিজ্ঞানের চুট্‌কী খুব সোজা ভাষায় চমৎকার করে লিখে তোমাদের উপহার দিয়েছেন। এরকম বিজ্ঞানের গল্প তিনি আগেও তোমাদের জন্যে "আমার দেশে" লিখেছেন ;—পরেও আরও লিখ্‌বেন। এগুলি পড়ে তোমরা যেমন অনেক জিনিষ শিখ্‌তে পারবে, তেমনি যারা "আমার দেশ" পড়েনি, সেই সব ছেলে-মেয়েদের এইসব জিনিষ প্রশ্ন করে ঠকাতে পারবে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত জন্মিবার পরে একশ বছর কেটে গেল। মাইকেলকে ভালভাবে জানবার সুযোগ তোমাদের এখনও হয়নি ;—কিন্তু একহিসেবে তিনি বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা বলা চলে। তাই তাঁর এই শততম জন্মতিথি উপলক্ষে বাঙ্গালা দেশে মহা উৎসব হচ্ছে। এই সংখ্যার "আমার দেশে" মাইকেলের একটী ছোট্ট জীবনী দেওয়া গেল।

এই ফাল্‌গুন মাসের "আমার দেশ" একটু আগে আগে বের করা হল। এতে তোমরা যে খুব খুসী হবে তা আমি জানি। কত আগ্রহেই না তোমরা "আমার দেশের" জন্য পথ চেয়ে বসে থাক ! এবার থেকে ফি মাসেই যাতে "আমার দেশ" এমনি আগে বের হয়, আমরা তারই বন্দোবস্ত করছি। আজ তবে বিদায়।

———

ফাল্গুন মাসের ধাঁধা

১। আমি আছি আকাশেতে,
আমি আছি ত্রিদিবেতে,
ধরাতলে যত জীব
সবে আছি আমি।
কিন্তু শিশু, নহি আমি
ত্রিলোকের স্বামী ॥
এ বড় আশ্চর্য্য কাণ্ড
খুঁজে দেখ এ ব্রহ্মাণ্ড
অন্য মাঝে পাবে মোরে
মোর মাঝে নাই।
আমিহীন আমি কোথা
খুঁজে পাবে ভাই ?
—কুমারী হাসিরাণী মিত্র।

২। আকাশে ওড়াই ছিল যে কাজ,—
সে চাকরীটুকু গিয়েছে আজ।
কোন দেশে আর কদর নাই।
খেলার জিনিস হয়েছি তাই!
আছে এই নামে আরেকজন—
মেয়েরা জানে তা বিচক্ষণ!
ভাঁড়ারের কোণ, রান্নাঘর,
খুঁজে খুঁজে দেখ অতঃপর!
—শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

৩। নহে সে ভালুক, নহে সে বাঘ,
কুকুরের তবে কিসের রাগ ?—
তাহারি পিছনে ডাকিয়া মরে,
ছেলেরা পলায়, পাছে সে ধরে।
অক্ষর আছে তিনটি মোটে,
প্রথম ছাড়িলে তোমারি ঠোঁটে;
মধ্যম যদি ছাড়িয়া দাও,
কাগজে কলমে দেখিতে পাও,
শেষটি ছাড়িলে বুঝিবে হার,
কি নাম বলত বস্তুটার ?
—শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু।

৪। চারি বর্ণে ফল আমি, শ্বেতবর্ণ দেহ,
আমারে না দেখিয়াছে নাহি হেন কেহ;
আদি ও দ্বিতীয়ে মিলে ফল পুনরায়,
একে তিনে যাহা হয় অর্থ পাওয়া দায়;
একে চারে শুধু ফাঁকি, সত্য বৃথা খোঁজা,
তিনে চারে পাই যদি লাইন টানি সোজা।
শ্রীমায়াময়ী মজুমদার।

বাঙ্গালা দেশের ছোট ভাইবোনগুলি,—

এবারকার "আমার দেশ" একটু আগে আগে ছাপিয়া বাহির হইল। এখন পর্য্যন্তও মাঘ মাসের ধাঁধার উত্তর দু'একটীর বেশী আমাদের হাতে পোঁছে নাই। তাই ফাল্গুন মাসের ধাঁধার উত্তরের সহিত মাঘ মাসের ধাঁধার উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা তোমাদের নাম ছাপিব, স্থির করিয়াছি। ফাল্গুন মাসের ধাঁধাগুলির উত্তর পাঠাইতে তোমরা সবাই চেষ্টা করিও। এই ধাঁধাগুলি যদিও একটু শক্ত, কিন্তু ইহাতে তোমাদের বুদ্ধি বুঝা যাইবে। আর তা ছাড়া, যে ছেলে বা মেয়ে ফাল্গুন মাসের সব ধাঁধাগুলির নির্ভুল উত্তর সবচেয়ে আগে আমাদের নিকট পাঠাইতে পারিবে, তাহাকে আমরা "শিল্পকলা চিত্রে ও গল্পে" নামক অসংখ্য ছবি ওয়ালা একখানি বই পুরস্কার দিব। নামের সঙ্গে তোমাদের বয়সও লিখিও। ইতি—

সম্পাদক—আমার দেশ
৫৭ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছেলেমেয়েদের খবরের কাগজ

[বিলাতে Children's Newspaper প্রভৃতি চমৎকার চমৎকার খবরের কাগজ বাহির হয়—সে দেশের ছেলে মেয়েদের জন্য। ইহাতে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে লেখা থাকে সেই সব খবর যাহা প্রত্যেক ছেলেমেয়েরই জানা উচিৎ ;—ছেলেদের যাহা জানা আবশ্যক নাই এমন কোনও খবর ইহাতে থাকে না। এই উপায়ে বিলাতের ছেলেমেয়েরা বিশ্বের কর্ম্মক্ষেত্রের সহিত—বিশ্বের চিন্তাধারার সহিত—বাল্য হইতেই পরিচিত হইয়া উঠে। বাংলা ভাষায় এরূপ কোনও পত্রিকা নাই। এই অভাব দূর করিবার জন্য আমরা অতঃপর প্রতিমাসে "আমার দেশে" 'ছেলেমেয়েদের খবরের কাগজ' বাহির করিব। সম্পাদক,—]

রোগশয্যায় মহাত্মা গান্ধী

ভারতবাসীর অতি আপনার, ভারতের শ্রেষ্ঠ গৌরব মহাত্মা গান্ধীর কথা নিশ্চয়ই তোমরা জান। আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষিরা তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলী দিতেছেন।
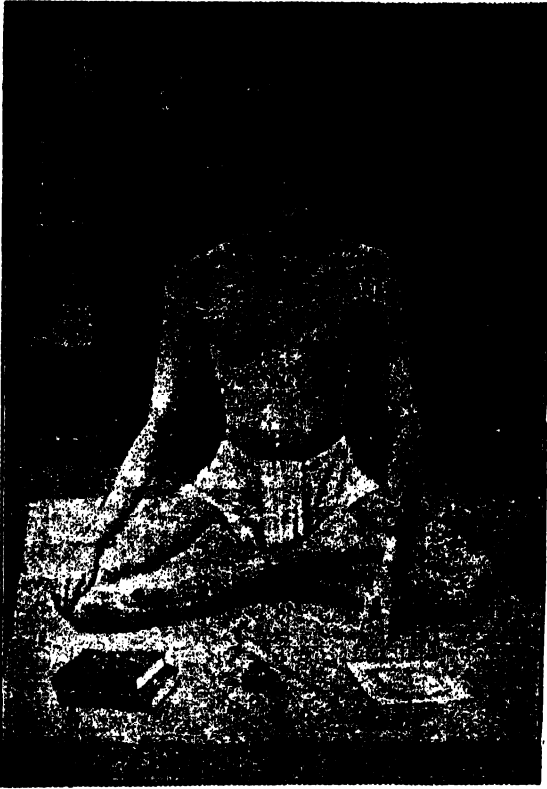
মহাত্মা গান্ধী।

অনেকেই মনে করেন যে মহাত্মা গান্ধী পৃথিবীর মধ্যে একজন অসাধারণ ব্যক্তি। কেহ ধনে বড় হয়, কেহ মানে বড় হয়, কেহ বা ত্যাগে বড় হয়। মহাত্মা গান্ধীকে ত্যাগে এবং চরিত্র বলের জন্য সকলেই ভক্তি শ্রদ্ধা করে। আমাদের দেশের তিনি বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বপ্রধান নেতা।

তোমরা বোধ হয় জান যে দুই বৎসর আগে সরকার এই মহাপুরুষকে রাজদ্রোহের অপরাধে কয়েদ করেন। প্রায় দুই হাজার বৎসর আগেও একজন গরীব ছুতোরের ছেলেকে তখনকার দিনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রতাপশালী সম্রাটের একজন বিচারক রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া দুইটি চোরের সহিত ক্রুশ-বিদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রাণবধ করেন। সেই ছুতোরের ছেলেকে পৃথিবীর সকলেই একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলিয়া মানেন। রোমের সাম্রাজ্য কোথায় ধূলিতে পড়িয়া গড়াগড়ি খাইতেছে, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টকে এখন অনেকেই অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া মনে করিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন। এই কথাটা তোমাদিগকে এই জন্য বলিতেছি যে সরকার সব সময়েই যে চোর ডাকাতকে সাজা দেয় তাহা নহে, কখন কখন এমন সব লোককে শাস্তি দেয় যাঁহারা বিচারকেরও পর্য্যন্ত নমস্য। তাঁহার চরিত্রের জন্য তাঁহার ত্যাগের জন্য একজন আমেরিকান পাদ্রী মহাত্মা গান্ধীর সহিত যীশু খ্রীষ্টের তুলনা করিয়াছেন। তিনি ৬ বৎসরের মেয়াদে বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত যারবেদার জেলে আছেন। এই মাসে খবর আসিয়াছে যে কিছুদিন হইতে তিনি জ্বরে ভুগিতেছিলেন বলিয়া, ডাক্তার সন্দেহ করে যে তাঁহার পেটে অস্ত্র করিবার প্রয়োজন আছে। যে ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন তাঁহার নাম কর্ণেল মাডক, তিনি অতিশয় ভদ্রলোক, তাঁহার সুচিকিৎসার জন্য তিনি নিজে মোটরে করিয়া মহাত্মাজীকে পুণায় লইয়া আসেন এবং সেখানে তাঁহার পেটে অস্ত্র করেন। অস্ত্র করিবার

সময় কয়েক মিনিটের মধ্যে বৈদ্যুতিক বাতিগুলি হঠাৎ নিভিয়া যাওয়াতে ডাক্তার সাহেবকে কিছু গোলে পড়িতে হইয়াছিল। যাহা হৌক, তাঁহার অস্ত্র চিকিৎসা নিরাপদে শেষ হইয়া যায়; এখন খবর আসিয়াছে যে তিনি বেশ ভাল আছেন। সমস্ত দেশ তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে, তাঁহার কথা শুনিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। তাঁহার রোগ যাহাতে শীঘ্র সারিয়া যায়, তাহার জন্য তোমাদের মতন কোমলমতি শিশুগণ যদি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, তাহা হইলে ভগবান নিশ্চয়ই তোমাদের কথা শুনিবেন। ভগবানের দয়া, তাঁহার অপার প্রেম বর্ত্তমান কালে একমাত্র মহাত্মার মধ্যে যেমন সুস্পষ্ট-ভাবে দেখা যায়, এমন আর কোন মানুষেই দেখা যায় না; সেইজন্য আমরা মহাত্মা গান্ধীকে এত ভক্তি করি।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী দেশের একজন বড় নেতা, তিনি খুব নামজাদা লোক। মহাত্মার পেটের অস্ত্র হইবার পূর্ব্বে তিনি মহাত্মার সহিত দেখা করেন, তিনি অন্যান্য কথার প্রসঙ্গে মহাত্মার কাছ হইতে ভারতবাসীর জন্য একটি উপদেশ-বাণী চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ হইতে একটি কথা যদি লোকে শুনিতে পারিত, তাহা হইলে দেশের লোকের কত না আনন্দ হইত! কিন্তু মহাত্মা উত্তরে বলেন যে "আমি জেলের কয়েদী, আমি জেলের নিয়ম অনুসারে কোন উপদেশ বাহিরে প্রচার করিতে পারি না—বাহিরের কাছে আমি মৃত।" মহাত্মা গান্ধীর সহিত সরকারের ঝগড়া, সরকার তাঁহাকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে। দেশের লোক তাঁহার কত আপনার তাহা তোমরা বড় হইলে বুঝিতে পারিবে। মহাত্মা যদি মহাত্মার মতন বড় না হইতেন তাহা হইলে তিনি এই সুযোগ আমাদিগকে এমন একটি উপদেশ-বাণী শুনাইতে পারিতেন যাহা গর্ব্বের সহিত সমস্ত ভারতবর্ষের আপামর লোক চিরকালের জন্য পালন করিত; অস্ত্রের পরে হয়ত, তাঁহার মৃত্যু হইতে পারিত, কিন্তু এই জীবন মরণের সন্ধি-স্থলেও মহাত্মা জেলের নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া দেখাইলেন যে কয়েদ কখনও মানুষের সর্ব্বোচ্চ মনুষ্যত্ব খর্ব্ব করিতে পারে না।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাত্মার দলের লোক নহেন, কিন্তু তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইল "ধন্য ভারতবর্ষ—যাঁহার রাষ্ট্রগুরু মহাত্মা গান্ধী।"

লেনিনের মৃত্যু

মহাত্মা গান্ধী পৃথিবীর অদ্বিতীয় পুরুষ, কিন্তু তাঁহার নীচেই যদি কাহারও স্থান হইতে পারে, তাহা হইলে তাহা রুশদেশের নিকোলে লেনিন। তিনি একজন অসাধারণ পুরুষ। গত যুদ্ধে রুশ ফরাসী ইংরেজ এক পক্ষে জর্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। রুশ দেশের সম্রাট ছিলেন দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা—তিনি যাহা হুকুম করিতেন তাহাই হইত। দেশের লোকেরা এইরূপ শাসন মোটেই পছন্দ করিত না। প্রজা-

লেনিন।

দিগের মধ্যে ঘোর অসন্তোষ ছিল। এই সব কারণেই রুষের সম্রাট জর্ম্মাণদিগের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে গিয়া যে কি নাকাল হইয়াছিল, তাহা তোমাদিগকে বলিয়া শেষ করিতে পারি না। দেশের লোক অকাতরে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিত, কিন্তু সম্রাটের অযোগ্য কর্ম্মচারীদের জন্য যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিত না। এই জন্য রুশদেশে বিপ্লব বাধিল, এই বিপ্লবে কত নেতা উঠিলেন, পড়িলেন যে তাঁহার ঠিক ঠিকানা নাই। এই বিপ্লবের পূর্ব্বে নিকোলে লেনিন

ছিলেন সুইট্জারল্যাণ্ডে। যাঁহারা সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেন তাঁহারা য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করিতেন, রুষদেশে গেলে তাঁহাদের প্রাণের ভয় ছিল। রুষদেশের কত বড় বড় জ্ঞানী লোক যে এইরূপ লক্ষ্মী ছাড়ার মতন দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। লেনিন ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন একজন। বিপ্লবের খবর যখন তাঁহার কাছে গেল তখন তিনি সুইট্জারল্যাণ্ড ছাড়িয়া রুশদেশে চলিয়া আসিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি রুশদেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। দেশে তখন কি ভয়ানক অশান্তি এবং গোলযোগ, এমন অবস্থায় লেনিন ছাড়া আর কোন লোকই এতকাল দেশে নিজের প্রতিপত্তি রক্ষা করিতে পারিত কিনা সন্দেহ, কিন্তু লেনিনের মতন লোক রুশদেশে তখন কেহই ছিল না। তিনি রুশ সরকারের সভাপতির পদ লইয়া দেশে তাঁহার মতের মতন শাসনবিধি প্রচলিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যে শাসনবিধি তিনি রুশদেশে প্রতিষ্ঠিত করেন তাহাকে লোকে বোলশভিক বলে, বোলশভিক শাসনে কোনও লোক বলিতে পারে না যে "এই জায়গা আমার, এই বাড়ীটি আমার" দেশের সমস্ত সম্পত্তিই সর্ব্ব সাধারণের, প্রত্যেকে তাহার সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করিয়া নিজের খাওয়া পরা উপার্জ্জন করিবে, প্রত্যেকটি গ্রামের ব্যবস্থা সেই গ্রামের লোকেরা করিবে; যাহারা খাটিয়া খুটিয়া রোজগার করে তাহাদিগকে শ্রমজীবী বলে, এই শ্রমজীবিদিগের হাতে রুশের শাসনভার থাকিবে; কিন্তু এইরূপ শাসনবিধি য়ুরোপের অন্য কোথাও প্রচলিত নাই, যদি অন্য কোথাও অনুকরণে এইরূপ শাসনপদ্ধতির প্রচলন হয়, তাহা হইলে ধনী এবং জমীদারদিগের মহাবিপদ, এইজন্য ইংরাজ সরকার বিস্তর সৈন্য সামন্ত রুশের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন, তাঁহাদের নৌবহর পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, তাই জাহাজ পাঠাইয়া দিয়া সমুদ্রের পথ আগলাইয়া বসিলেন, ইহাতে রুশদেশে যে খাবারের খাকতি হইল, তাহার জন্য অসংখ্য রুশগণ অনাহারে মরিতে লাগিল। রুশদেশে বিদেশী সৈন্য আসিয়া অসম্ভব অত্যাচার করিয়াছিল, এই সমস্ত কারণে দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল; কিন্তু নিকোলে লেনিন একাকী এই সমস্ত বিদ্রোহের বিরুদ্ধে লড়িতে লাগিলেন। তাঁহার অধীনে যে সৈন্যসামন্ত ছিল, তাহাদিগকে লোকে লাল সৈন্য বলে, ইহারা ইংরাজ সৈন্যদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়া রুশের স্বাধীনতা বজায় রাখিলেন, লেনিনের অসাধারণ প্রতিভার ফলে এখন য়ুরোপের বিভিন্ন জাতি সকল রুশের সঙ্গে মিতালি করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছে।

লেনিন এতদিন বাতে ভুগিতেছিলেন, এখন খবর আসিয়াছে যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার মৃত্যুতে রুশের সমস্ত লোক চোখের জল ফেলিতেছে এবং হায় হায় করিতেছে।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম তোমরা হয়ত অনেকেই শুনিয়াছ, ইনি প্রায় ১৮ বৎসর ধরিয়া কলিকাতা বিশ্ব-

আশুতোষ।
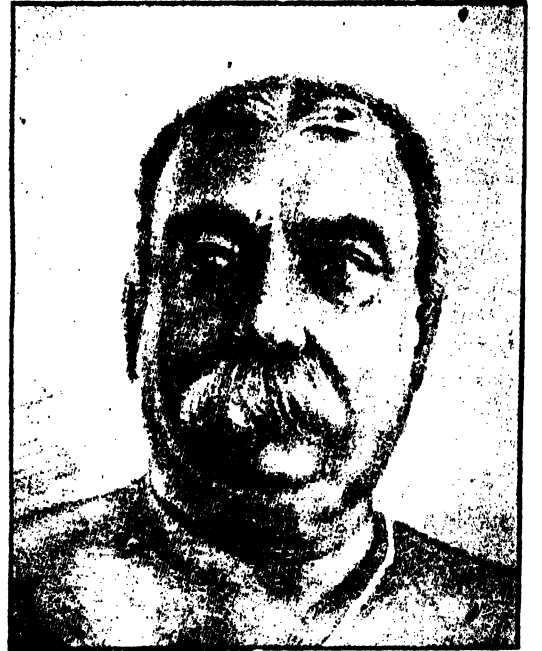
বিদ্যালয়ের কাজ চালাইয়া আসিতেছেন, সরকার হইতে যিনিই ভাইস্ চান্‌সেলার হন না কেন, আশুবাবুই প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ এতদিন হইল চালনা করিয়া আসিতেছেন, ইনি বিশ্ববিদ্যালয়কে যে কতদিক হইতে বাড়াইয়াছেন

তাহা তোমরা যখন কলেজে পড়িবে তখন জানিতে পারিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কাজ তিনি করেন, একজন সাধারণ লোকের পক্ষে সেই কাজই যথেষ্ট, কিন্তু স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হাইকোর্টের একজন বিচারক, সেখানেও তাঁহার বিস্তর কাজ। প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া তিনি বিচারকের কাজ অত্যন্ত সুযোগ্যতার সহিত করিয়া গত জানুয়ারী মাসের প্রথম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন; ইনি এখন হইতে স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসা করিবেন। এখন সকলেই আশা করেন যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী সময় দিতে পারিবেন, তাঁহার কার্য্যের সফলতার উপরে তোমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

চৌরঙ্গীতে সাহেব হত্যা

সেদিন কলিকাতায় চৌরঙ্গীর রাস্তায় একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়াছিল; এর্নেষ্ট ডে নামে একজন সাহেব সকাল বেলায় হাওয়া খাইতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন, হঠাৎ একজন বাঙ্গালী যুবক কোথা হইতে আসিয়া তাঁহাকে গুলি ছুড়িয়া আহত করিয়া ফেলিল, সাহেবটি যখন মাটিতে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতেছিলেন তখনও সেই যুবকটি তাহার উপর গুলি ছাড়িতে থাকে, অনেকগুলি গুলি খাইয়া যখন সাহেব অজ্ঞান হইয়া পড়িল তখন এই বাঙ্গালী যুবকটি লোককে গুলির ভয় দেখাইয়া ছুটিতে থাকে, একজন মোটর গাড়ীর চালক তাহাকে মোটরে লইয়া যাইতে অস্বীকার করায় তাহাকে সে গুলি ছুড়িয়া জখম করে, অপর আর একটি মোটর চালককে এমনভাবে আহত করিয়া বাঙ্গালী যুবকটি পলাইবার জন্য প্রাণপণ দৌড়াইতে থাকে, রাস্তার অনেক লোক নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া তাঁহার পেছন ধাওয়া করে। সাহেবটিকে হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হয় এবং কয়েকঘণ্টা পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

অবশেষে রিপণ ষ্ট্রীটে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই বাঙ্গালী যুবকের নাম গোপীনাথ সাহা, আদালতে সে বলিয়াছে যে তাঁহার পুলিস কমিশনার টেগার্ট সাহেবকে মারিবার অভিপ্রায় ছিল, ভুলক্রমে সে অপর একজনকে খুন করিয়াছে বলিয়া অতিশয় দুঃখিত। আদালতে এই বাঙ্গালী যুবকটি সাক্ষীদের জেরা করিতেছে, হাসিতেছে, বিদ্রূপ করিতেছে, কোন বিষয়ে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

এই ব্যাপারে সাহেবদের ভয়ানক আতঙ্ক হইয়াছে, তাঁহারা সরকারকে পুলিশের শক্তি বাড়াইবার জন্য অনুরোধ, করিয়াছেন; তাঁহাদের ভয় হইবার ত কথা, কারণ দিন দুপুরে যদি কলিকাতার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল রাস্তায় যদি এমন ঘটনা ঘটে তাহা হইলে লোকজনের রাস্তায় চলাফেরা করা ত ভয়ানক মুস্কিলের কথা হইয়া পড়ে।

যে লোকটি এই নৃশংসভাবে আর একজন লোকের জীবন লইতে পারে তাহাকে কেহই প্রশংসা করিতে পারে না। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণ হত্যাকারী নয়, ইহারা মনে করে যে দেশকে স্বাধীন করিতে হইলে খুন খারাপি করিতে হয়। পৃথিবীতে যেখানে সরকারের সহিত প্রজার ঝগড়া থাকে সেইখানেই এইরূপ কাণ্ড ঘটে। আমাদের দেশে কেহ কেহ মনে করে যে এইরূপ করিলে দেশ স্বাধীন হইবে; মানুষের মনে কে যে কি বিষ ঢুকাইয়া দিয়াছে —যে রক্তারক্তি না হইলে বীরত্ব প্রকাশ করা যায় না, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কত লোক যে তাহাদের জীবন অকাতরে বিসর্জ্জন করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কি শুভক্ষণে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার দেশবাসীকে শুনাইয়াছিলেন—"অন্যায়কে কখনও স্বীকার করিও না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইও, কিন্তু কখনও অন্যায়কারীর জীবন লইও না।" বাস্তবিক পক্ষে ইহাই বীরত্বের আদর্শ, কিন্তু আজ মহাত্মা জেলে। দেশের নামে লোকে অন্যায় ও নৃশংসতা করিতেছে, ইহাতে সকলের দুঃখ হওয়া উচিত।

STOP PRESS.

এইমাত্র খবর পাওয়া গেল, মহাত্মা গান্ধী কারামুক্ত হইয়াছেন।

৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪।

শিশুতোষ সিরিজ
সম্পাদক: শ্রীশিশির কুমার মিত্র
আশ্বিন ১৩২৭ হইতে প্রতি মাসে একখানি করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যেক বই-তে অনেকগুলি করিয়া ছবি আছে। মোটা এন্টিকে, রং- বেরঙের কালিতে ছাপা।
সডাক বার্ষিক মূল্য ৪৲ ষাণ্মাষিক মূল্য ২৲, প্রতি সংখ্যা ।৵০।
১। পৃথিবীর জন্ম ২। প্রকৃতির পরাভব
৩। কানুর কীর্ত্তি ৪। আর্য্য ও অনার্য্য
৫। আজগুবি জন্মকথা
৬। ছেলেদের বিষ্ণুপুরাণ
৭। গল্পে রামকৃষ্ণ ৮। সত্যযুগের কথা
৯। উদোলবুড়োর সাঁওতালি গল্প ১০। রামকৃষ্ণের আরো গল্প
১১ সতী ১২। উদোলবুড়োর আরো গল্প
১৩। বাপ্পাবীর ১৪। পৌরাণিক জন্মকথা
১৫। মহম্মদ মহসীন ১৬। কর্ম্মদেবী
১৭। মজার গল্প ১৮। ভীষ্ম
১৯। রামকৃষ্ণের নূতন গল্প ২০। জাতকের গল্প
২১। হামির ২২। রামকৃষ্ণের দেদার গল্প
২৩। ঠাকুরদের গল্প ২৪। ভাই ভাই ২৫। কালিদাসের আজব গল্প
২৬। ডাইনি মাসী ২৭। রাজকন্যা ২৮। চণ্ড ২৯। আজব গল্প
৩০। স্বপ্নপুরী ৩১। রাণা কুম্ভ ৩২। রাজপুত্র ৩৩। গল্পকথা
৩৪। বোকা আইভান (টলষ্টয়) ৩৫। সপ্তর্ষি (টলষ্টয়) ৩৬। বন্দী (টলষ্টয়)
৩৭। লোভের উৎপত্তি (টলষ্টয়) ৩৮। গ্রীসের উপকথা